পদ্মাসনা ভারতী

প্রতিভা বসু

প্রকাশক:
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা:) লি:
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক:
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা:) লি:
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ:
ধীরেন সাসমল

প্রথম প্রকাশ
১৫ই এপ্রিল ১৯৬৫

পদ্মাসনা ভারতী

স্বামী বাড়ি নেই, সুতরাং কাজও নেই। একদিন রাঁধলে তিনদিন। আর রান্নাই বা কী? হলেই হ'লো। তার উপরে আজ তো লাঞ্চেরও পাট নেই। সকালের চা খেয়ে তৈরী হচ্ছিলাম বেরুবার জন্য, টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হ'লো। এখানকার এই আচমকা বৃষ্টি মাঝে-মাঝে বড়ো বিপদে ফেলে। যেমন এই মুহূর্তে। বিপদ বলাটা অবশ্য ঠিক হ'লো না, বলা উচিত বিপাক।

একা বাড়িতে একদম ভালো লাগে না। তার উপর এ আমার স্বদেশভূমি নয় যে একজন না থাকলেও অন্যজনেরা ঘিরে থাকবে। পরিবার পরিজন বলতে যা বোঝায় তার তিলতম চিহ্নও এখানে অনুপস্থিত। বছর কয়েক যাবৎ এমনই দুর্দান্ত এক বিদেশে প্রবাসী হ'য়ে আছি। তবে এই শহরে এসেছি মাত্র একমাস। বেরুবার একটা কারণ ঘটলেই আমি সুখী হই, অকারণেই অনেক ঘুরি, কিন্তু আজ সত্যিই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চমৎকার একটা প্রোগ্রাম আছে।

বৃষ্টি থামলো। ব'সে ব'সে বই পড়ছিলাম তাড়াতাড়ি উঠে আবার পা বাড়ালাম বেরুবার জন্য। ফোন। খবর এই যে এখুনি ভারতবর্ষ থেকে কথা বলবে মেয়ে! অপেক্ষা করতে হবে। মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। বেরুনো-টেরুনো সব ভুলে এই অপেক্ষার সুখ উপভোগ করতে লাগলাম। কতোদিন দেখি না, গলার স্বর শোনাটাই কি সোজা কথা? পৃথিবীর এক প্রান্তে আমরা অন্য প্রান্তে এই মেয়ে। সবচেয়ে দূরতম দুই দেশে আছি দু'জনরা। আবার বসলাম। উচ্চকিত সময় দ্রুত কাটে না, হাতের ঘড়ির দিকে বারে-বারে দৃষ্টি

নিবদ্ধ হ'তে লাগলো। এই ক'রে-ক'রে ঘড়ির কাঁটা ন'টা থেকে কখন বারোর ঘর ছাড়িয়ে গেলো। একটাও বাজলো। ফোন এলো সোয়া দু'টোতে। কথা আর কতোটুকু সময়। একটা পলকও নয়। তবু এতো উত্তেজিত হ'য়ে পড়লাম যে বুক পিঠ কপাল ঘেমে গেলো। ফোন ছেড়ে দেবার পরেও ওপারের গলার রেশ অনেকক্ষণ আচ্ছন্ন ক'রে রইলো মন। ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করলো, ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হৃদয় দপ্‌দপ্‌ করতে লাগলো বুকের মধ্যে।

এখন আর নিশ্চয়ই কারো বাড়িতে গিয়ে লাঞ্চ খাবার সময় নেই। কাজেই দুপুরের খাওয়াটা ঘরেই খেয়ে নিতে হ'লো, তাই বেরুতে বেরুতেও দেরি হ'য়ে গেলো অনেক। হোক। মনটা ছল ছল করছিলো মেয়ের সঙ্গে কথা ব'লে।

যাবো বোল্ডার থেকে ডেনভারে। বাস স্টেশনে এসে দেখি স্টেশনটা ফাঁকা। সব বাসই প্রায় বেরিয়ে গেছে, বললো দশ মিনিট বাদে আবার ছাড়বে একটা। দেখলাম সেটাই এখন ধোয়া-মোছা হচ্ছে, জল-টল খাচ্ছে, চালক হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে।

দশ মিনিট দাঁড়ানো বড়ো সহজ কথা নয়। তার উপরে সূর্য ভীষণ তেজী হয়েছে পড়ন্ত বেলায়, চারদিক ঘেরা খোঁচা খোঁচা উঁচু নিচু পাহাড়ের চূড়ো থেকে এ-ফোঁকরে ও-ফোঁকরে ঢুকে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তর দিয়ে প্রচণ্ডভাবে ফোকাস ফেলছে মুখের উপর। চোখ ঝলসে যাচ্ছে। ছাতা মাথায় দিয়েও সূর্যের বিক্রমের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যাচ্ছে না। ছায়া খুঁজছিলাম। এই সময়েই একটা মার্সেডিস বেঞ্চ এসে দাঁড়ালো তেল নিতে। ভিতরে কোনো আরোহী ছিলো না, ফাঁকা। শুধু চালকের আসনে একজন মহিলা, শাড়ি পরিহিতা।

মহিলাটির মুখ পাশ ফেরানো, বাঁ হাতটা স্টিয়ারিংয়ের উপর, কোমল নরম ফর্সা। মধ্যমার পরের আঙুলের আংটির হীরে সূর্যের মতোই চোখ ধাঁধাঁনো। একটু পরেই গাড়ির দরজা খুলে সে নামলো। ঘন কমলা রং ঘন বুনোটের দক্ষিণী সিল্কের শাড়িতে ব্লাউজে, দক্ষিণী মেয়েদের মতোই ফুল গোঁজা লম্বা বেণীতে। যেন একটা আগুনের শিখা। আমি তাকিয়ে থাকতে-থাকতে চমকে ব'লে উঠলাম, 'আরে, রজতের বৌ না?'

বলাই বাহুল্য, অসতর্ক মুহূর্তে মাতৃভাষাই বেরিয়ে আসে মানুষের মুখ দিয়ে। আমিও তার ব্যতিক্রম হলাম না। এই ভিন্নভাষার স্বগতোক্তি শুনে একজন মার্কিন ভদ্রলোক ফিরে তাকালেন, সেই মহিলাও তাকালো। অন্য দিকে যেতে-যেতে থামলো, আর তারপরেই বালিকার মতো ছুটে এলো লঘুপায়ে। বালিকার মতোই গলা জড়িয়ে ধ'রে ডেকে উঠলো, 'সবিতাদি।'

আমিও তাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলাম, 'সীতা! তুই! তুই এখানে?'

সীতা বললো, 'কী আশ্চর্য। কী আশ্চর্য!'

আমি খুশিতে ডগোমগো হ'য়ে বললাম, 'রজতও যে এই দেশে এসেছে তাতো আমি জানতাম না। কবে? কবে এলি?'

আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে সীতা বললো, 'মাস তিনেক।'

'ঈশ! দেখা হ'লো এতোদিনে? কোথায় বাড়ি নিয়েছিস?'

'আমি ডেনভারে আছি।'

'ডেনভারে? আমি তো ডেনভারেই যাচ্ছি। এখানে কেন এসেছিলি, কেউ আছে?'

'আসি মাঝে মাঝে—'

'রজত আসেনি সঙ্গে? কী কাজ নিয়ে এসেছে এখানে? ওর

চাকরি বদলাবার নেশাটা এখনো তেমনিই আছে নাকি ?'

সীতা চোখ নিচু ক'রে বললো, 'রজত আসেনি।'

'আসেনি ? মানে ? কোথায় আসেনি ?'

'কোথায় আর ? এখানে। এ দেশে।'

'ওমা, রজত আসেনি তো তুই এলি কার সঙ্গে ?'

'বারে, একা বুঝি আসা যায় না ?'

'তা কেন যাবে না। তবে—'

'তবে আমার মতো একটা অশিক্ষিত মূর্খ গাঁইয়া'—গজদন্ত দেখিয়ে সীতা হাসলো। এই গজদন্তটি দেখেই একদিন রজত পাগল হ'য়ে গিয়েছিলো। কতো কাণ্ড ক'রে বিয়ে করলো।

'মোটেও না—' আস্তে চড় মারলাম পিঠে।

'এবার তোমার খবর জিজ্ঞেস করি, তুমি এখানে কবে ?

'একমাস, হ'য়ে গেলো।'

'বিমানদা কোথায় ?'

'বিমান এখানে এসেছে সামার ক্লাশ পড়াতে, আপাততঃ অন্য একটা কাজে অন্যত্র গেছে।'

'তুমি একা আছো ?'

'আর কি—'

'ক'দ্দিন থাকবে ?'

'আরো ছ'মাস।'

'কী মজা !'

'মজার কী দেখলি ?'

'বা, তোমরা থাকবে আর আমার মজা না ?'

'তোর মেয়াদ ক'দ্দিন ?'

'আমার ? আমি ছ'মাসের জন্য এসেছি।'

'কী করতে ? কোনো ট্রেনিং ? কোনো থীসিস্ টিসিস্

করছিস নাকি ? দেশে তা হ'লে রজত'—আমার মনে ঝাঁকে-ঝাঁকে প্রশ্ন আসছিলো। সীতা বললো, 'শুনেছিলাম তোমরা ব্রুকলীনে আছো—'

'এখনো তাই। কার কাছে শুনেছিস ?'

'ভারতভূমি সাপ্তাহিকে তোমার লেখা তো পড়ি। ভীষণ ভালো লাগে। তোমার এই ব্রুকলীনের পত্র দেশে খুব পপুলার।'

'তাই নাকি ?'

'আর আমি তো তোমার অন্ধ ভক্ত।'

'সত্যি ?'

'এই তো দেশ থেকে বেরুবার আগে তোমার একটা উপন্যাস "মেয়েরা মেয়েই" প'ড়ে এলাম। মেয়ে না-হ'লে কি মেয়ের দুঃখ কেউ এমন ক'রে বোঝে ? কোনো পুরুষ লেখকের সাধ্য নেই তাদের বেদনা এভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে।'

'তোর কথা আমার শ্রুতির পক্ষে খুবই সুখকর।'

'তুমি তো সব মেয়েদেরই একটা ইন্‌স্‌পিরেসন।'

'সীতা—' আমি সীতার এসব কথায় কান দিচ্ছিলাম না। আমার মনে অন্য কথা আন্দোলিত হচ্ছিলো।

ডাক শুনে সে তাকালো। বললাম, 'গাড়িটা কার রে ?'

হেসে বললো, 'চালিয়ে এলাম যখন নিশ্চয়ই আমার। এখানে কার গাড়ি আর পাবো আমি ?'

'তুই কিনেছিস ?'

'হ্যাঁ।'

'থাকবি তো বললি ছ'মাস, তার মধ্যে তিন মাস তো কেটে গেছে, মাত্র এই ক'দিনের জন্যে—'

'এখানে গাড়ির আর কী দাম। যাবার আগে বিক্রী ক'রে দিয়ে

যাবো।' খুব সহজেই বললো কথাগুলো, বোঝা গেলো আর যারই অভাব থাক, ডলারের অভাব নেই। আমি চুপ ক'রে ছিলাম। বললো, 'তোমার খোঁপাটা দেখছি এখনো তেমনিই মস্ত, ফাঁকি আছে নাকি? না চুলই সে রকম আছে?'

আমি বললাম, 'রজত তোকে একা একা ছেড়ে দিলো ছ'মাসের জন্য?'

সে বললো. 'জানো সবিতাদি, ডেনভারের চেয়ে কলোরাডোর এই বোল্ডার শহর অনেক বেশী সুন্দর। আমি তো সুযোগ পেলেই এখানে চ'লে আসি। ছেলেবেলাকার ভূগোলে পড়া রকি হীল। কেমন রোমাঞ্চ হয়, না?'

'হ্যাঁ. ভারি সুন্দর শহর।' বুঝতে পারছিলাম সে এড়িয়ে যাচ্ছে, আমি ও-প্রসঙ্গ ছাড়লাম।

'সোনার খনি দেখেছো?'

'সোনা কি আছে?'

'তাতে কি খনি তো আছে। দেখবে খুঁড়ে খুঁড়ে লোভীরা কী ভাবে সব সাপটে নিয়েছে। একদিন জানো, নদীর ধারে বালুবেলায় গিয়ে কয়েকজন মিলে খুব সোনা খুঁজলাম। সবাই বলেছিলো, এখনো বালির মধ্যে নাকি সোনা পাওয়া যায়।'

'পেলি?'

'ইট্টুখানি পেলাম। ওজনটা কিছু নয়, কিন্তু সত্যি যে পেলাম তাতে কী উত্তেজনা আমাদের।'

'উত্তেজিত হবার মতোই তো।'

'এবার আমি তোমাকে নিয়ে খুব ঘুরবো। কী যে ভালো লাগছে তোমাকে দেখে। ও সবিতাদি, আমি বোধহয় তোমাকে এখনো তেমনি ভালোবাসি। সেই ছেলেবেলাকার মতোই।'

'তুই কি বাড়ি ফিরছিস?'

'তুমি/ডেনভারে কেন যাচ্ছো ? দোকান বাজার ?'

'না রে না, এখন একজন বন্ধুর ওখানে যাবো, তাদের সঙ্গে একটা নাচ দেখতে যাবো সন্ধ্যায়।'

'নাচ ?'

'পদ্মাসনা ভারতীর নাম শুনেছিস ?'

'পদ্মাসনা ভারতী ? বোধহয়।'

'বোধহয় বলছিস কী ? এখন তো শুনি নাচে তার জুড়ি নেই। সারা জগৎময় খ্যাতি।'

'তাই বুঝি ? তুমি দেখেছো তার নাচ ?'

'এইবার এই এতোদিন বাদে এই সুদূর বিদেশে এসে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হবে।'

'কলকাতা থাকতে গ্যাখোনি তুমি ?'

'না। একবারই মাত্র এসেছিলো কলকাতায়, আমি তখন দার্জিলিং। দেশও তো ছেড়েছি বেশ কিছুদিন হ'য়ে গেলো—'

'ও।'

'এতো খ্যাতি অবশ্য এই ক'বছরের মধ্যেই।'

'তা ডেনভারের সঙ্গে সেই নাচিয়ের সম্বন্ধ কী ? এসেছে বুঝি ?'

'ডেনভারে থাকিস আর ডেনভারের আসল খবরটাই জানিস না ? আজ তার নাচ হবে যে বড়ো হল্-এ। ডেনভারে তার স্কুল মার্কিনীদের পীঠস্থান, কতো ছেলেমেয়ে যে সেখানকার ছাত্রছাত্রী তার ঠিক নেই। এই বোল্ডারে, এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকেই তো বেশ কয়েকজন শিখতে যায় সপ্তাহে দু'দিন। সবাই প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। বুঝলি, আমার খুব গৌরব হয়।'

'যেমনি তোমার বাজে দেশপ্রেম, তেমনি হুজুগে এই মার্কিন জাত।' সে হাসলো।

আমিও হাসলাম, 'জানিস তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মক্ষিরাণীই এখন পদ্মাসনা ভারতী। মহিলা যদি বাঙালী হয় কী ভালোই না হয় তবে।'

'কেন?'

'ভেবে ছাখ, কী রকম জয়জয়কার হবে বাঙালীদের।'

'যথা?'

'সেই সময় ছিলেন উদয়শঙ্কর, কী মান সম্মান খ্যাতি প্রতিপত্তি। আবার এখন এই মেয়ে। তাছাড়া সবই তো বাঙালী। রবিশঙ্কর, আলি আকবর, সত্যজিৎ—'

'উঃ, তোমার প্রাদেশিকতা দেখছি খুব প্রবল। বাঙালী বাঙালী ভাব ছাড়ো তো।'

'ছেড়েছি। এখানে এসে দেখছি বাংলা দেশ ব'লে কিছু নয়, গোটা ভারতবর্ষটাই আসল।'

'তবে এসব বলছো কেন?'

'তোকে দেখে। দেশ থেকে মেয়ের ফোন এলো, বেরিয়েই তোকে দেখলাম, মনটা যেন কেমন গণ্ডিবদ্ধ হ'য়ে গেলো।'

'আজ তা হ'লে তোমার রথ দেখা কলা বেচা ছুই-ই হবে কেমন?'

'অর্থাৎ?'

'নাচও দেখবে, বাঙালী কিনা তা-ও দেখবে।'

'না রে, নাচিয়েটি বাঙালী হোক আর না হোক, ভারতীয় যে সেই আসল। শুনেছি আশ্চর্য নাচে। সবাই বলে এমন আর কেউ কখনো দেখেনি। স্টেজের উপরে নাকি স্বর্গসুধা নামিয়ে আনে।'

'তা হ'লে আজ সেই কিন্নরীর সঙ্গে তোমার দেখা হবে?'

'দেখা হবে না, বল দেখবো। তবে দেখাও হবে শীগ্‌গির।'

'কোথায়?'

'বোল্ডারেও আসবে। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় আনাচ্ছে ওকে।'

'তাই নাকি?'

'কর্তৃপক্ষ তো রোজ গিয়ে ধর্ণা দিচ্ছে। তোর বিমানদাকেও একদিন নিয়ে যেতে চেয়েছিলো। বলছিলো, তুমি ভারতীয়, তোমার কথার দাম তাঁর কাছে আমাদের চেয়ে বেশী বলেই গণ্য হবে।'

'বিমানদা গেলেন না?'

'কই গেলো? জানিস না কীরকম লাজুক আর ঘরকুনো?'

'তাঁর হ'য়ে তুমি গেলে না কেন? তোমার কথায়ও নিশ্চয়ই কাজ হ'তো।'

'তা-ও বলেছিলো। আমারও লজ্জা করলো। যাকগে, তাতে আটকায়নি কিছু, উনি আসবেন কথা দিয়েছেন। এখানকার কলেজের অধ্যাপকরা বলছিলেন, মহিলা অতুলনীয়া, আচার ব্যবহার ভদ্রতা নম্রতা একেবারে—'

'বাঁধিয়ে রাখার মতো না?' ঠাট্টা ক'রে সীতা বড়ো গলায় হেসে-হেসে বললো, 'এদের পাত্তা পেতে দেখা যাচ্ছে কিছুই তেল লবণ লাগে না।'

'ওরকম বলিস না। ওরা তো আমাদের মনিবের জাত ছিলো না, তাই সহজেই যেমন বন্ধু হয় তেমনি সরল মনেই সমকক্ষের মর্যাদা দেয়। খুব গুণগ্রাহী জাত। আমার বেশ ভালো লাগে।'

'তা হ'লে তোমার সঙ্গে তার শীগ্‌গিরই দেখা হচ্ছে?'

'তাই তো মনে হয়। যদিও ঠিক কখন কোন তারিখে আসবেন ব'লে দেননি তবুও এঁরা ভাবছেন, সামারের মধ্যেই হবে সেটা। আমাকেই প্রথম অভ্যর্থনার ভারটা দেওয়া হবে সেটাও এরা স্থির করেছেন।'

'হঠাৎ তোমাকে কেন? ভারতীয় ব'লে? না লেখিকা ব'লে?'

'যুগপৎ দুই অর্থেই ভেবে নিতে পারিস। এদের কাছে তো

আমি বাঙালী লেখিকা নই, ভারতীয় সাহিত্যিক। ওদের ধারণা সারা ভারতের লোকই বুঝি নাম-ধাম জানে। ভাষার ব্যবধানে আমরা কেউ যে কারোকে চিনি না, ভাবতেই পারে না।'

'ঐ জন্যেই আরো ভাবছিলে যে বাঙালী হ'লে বেশী ভালো হয় তাই না?'

'ঠিক ধরেছিস। তবে আমার নিজের যদ্দূর ধারণা, দক্ষিণী মেয়ে, দক্ষিণ ভারতই তো নাচের স্বর্গভূমি। একবার বালাসরস্বতীও এসেছিলো, একেবারে মাতিয়ে দিয়ে চ'লে গেলো।'

এতোক্ষণে সীতার খেয়াল হ'লো গাড়ি তেল খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যস্ত হ'য়ে বললো, 'চলো চলো, ডেনভারে নিয়ে যাই তোমাকে।'

'তুই এক্ষুণি যাচ্ছিস তো?'

'গেলেই হয়। আমার তো অমনিই ঘোরাফেরার জন্য আসা। তবে কয়েক মিনিটের জন্য রেড ইণ্ডিয়ান বাচ্চাদের টি. বি. স্যানাটোরিয়ামটাতে ঘুরে যাবো একটু।'

'এখানে রেডইন্‌ডিয়েন্‌ আছে বুঝি?'

'বাচ্চারা আছে। দশমাস থেকে দশবছর বয়েস পর্যন্ত।'

'দশ মাসের বাচ্চারও আবার টি. বি. হয় নাকি?'

'হয়েছে তো। কী সুন্দর দেখতে বাচ্চাটা।'

'মা বাপ নেই?'

'আছে, দরিদ্র, এখন মেয়েটাকে বিক্রী করতে চায়।'

'বিক্রী! নিজের মা বাবা বিক্রী করতে চায়?'

'আরো পাঁচটি আছে, এটিকে কেউ নিলে আপত্তি নেই।'

'এ মা!'

'আমি ভেবেছি, আমি নেবো। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমি ভারতীয় ব'লে এই সংস্থার লোকেরা দিতে চায় না!'

'কেন?'

'বুঝতেই তো পারছো, এরা এখন শাদা চামড়ার মানুষদের কাছে একজিবিশন পিস মাত্র। রেডইন্‌ডিয়ন্‌ আছে নাকি বেশী? মেরে কেটে লোপাট ক'রে দিয়ে তবে তো বসেছে নিজেরা। আমাকে দিয়ে দিলে আমি তো আর ওকে মার্কিণীদের রাজত্বে ফেলে যাবো না, নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো দেশে।'

'কিন্তু তুই নিবি কেন, বল তো?

'ভীষণ মায়া প'ড়ে গেছে। প্রথম এসেছিলাম এমনিই হাসপাতাল দেখতে বন্ধুর সঙ্গে। রেডইন্‌ডিয়েন্‌ নামটা শোনা ছিলো, সখ ছিলো চোখে দেখবার, বন্ধু এখানে নিয়ে এলো, অদ্ভুতভাবে সেই বাচ্চাটা ঝাঁপিয়ে কোলে এলো আমার, কাঁদছিলো, ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো।'

'ও মা, তারপর?'

'আমার পোশাক দেখে অবশ্য সব বাচ্চারাই দারুণ উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছিলো, আমার কোমরের পুঁতিঝোলানো রঙিন চাবি দেখে টানাটানি করছিলো—'

'ছোঁয়াচের ভয় নেই?'

'না। এরা সব ভালো হ'য়ে গেছে। তবু ওষুধ খাচ্ছে, যত্নে আছে টি· বি-র চিকিৎসা তো এখন ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার মতোই, দেখলাম পুরিয়া ক'রে ক'রে ওষুধ গুঁড়ো ক'রে রেখেছে সব, খেয়ে নিচ্ছে বাচ্চারা—'

'ঐ বাচ্চাটা বুঝি কোলে এলো?'

'কোলে এলো মানে? কিছুতেই ছাড়িয়ে নিতে পারে না, তারস্বরে চিৎকার, কতো ভুলিয়ে-ভালিয়েও কিছু হ'লো না, শেষে জোর ক'রে টেনে নিলো নার্স।'

'তারপর?'

'তারপর খুব মন কেমন করছিলো রাত্রে। আবার দু'চারদিন বাদে চ'লে এলাম, সেদিনও ঠিক ঐ রকম, আবার আজ এসেছি।'

'এ মতলব তুই ছাড় সীতা, দেখিস রজতও রাজী হবে না, এরাও দেবে না, মিছিমিছি টান বাড়াচ্ছিস।'

'দেখলে তোমারও টান পড়ে যাবে, এতো মিষ্টি।'

'তো চল, দেখে আসি। এতো ঝামেলা ভালোবাসিস, চিরটাদিন একরকম।'

॥ দুই ॥

সীতার মার্সেডিস বেঞ্জ-এ উঠে আমি তারপর তার সঙ্গী হলাম। গাড়ি পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগলো। খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপ ক'রে থাকলাম। আমি মনে-মনে কেমন আন্দাজ করছিলুম একটা কোনো গণ্ডগোল ঘ'টে গেছে ওর পারিবারিক জীবনে, বলতে না চাইলে তো কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় না, তাই অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ভাবতে চেষ্টা করলাম কী হ'তে পারে। আর সীতাও বোধহয় তেমনিই কোনো ভাবনায় অন্যমনস্ক হয়ে রইলো।

সীতা আমার বাবার বন্ধুর মেয়ে, আবার এদিককার সম্পর্কে বিমানের কী রকম ভ্রাতৃবধূ। ছেলেবেলায় আমরা আর সীতারা পাশাপাশি বাড়িতে ছিলুম। সীতার বাবা জলপাইগুড়িতে উকিল ছিলেন আর আমার বাবা কলেজের লেক্‌চারার, আর তারও বহুপূর্বে দু'জনের বাবাই ঢাকা পোগোজ ইশকুলের সহপাঠী।

জলপাইগুড়িতে থাকতে আমরা বলতে গেলে প্রায় এক পরিবারের মতো বাস করতুম। সীতা আমার চাইতে বয়সে বেশ খানিকটা ছোটো, ছেলেবেলায় ওকে কী যে ভালোবাসতুম। ওর দিদিরা ওকে যতো না ভালোবাসতো আমি ভালোবাসতাম তার দ্বিগুণ। মাসিমা বলতেন, ঈশ্‌! আমার ছেলেটা আর একটু বড়ো হ'লে তোকে বৌ ক'রে নিতুম।

তারপর ঐ শহর ছেড়ে আমার বাবা অন্য চাকরি নিয়ে কলকাতা চ'লে আসেন। কিছুকাল চিঠি লেখালেখি ছিলো, আস্তে-আস্তে

কবে যেন শেষ হ'য়ে গেলো। তবু খবরাখবর পেতাম মাঝে-মাঝে, সীতার বড়দির যখন বিয়ে হ'লো, মাসিমা মেসোমশায় কতো ক'রে চিঠি লিখলেন যাবার জন্য, (যদিও যাওয়া হয়নি) তারপর আমার যখন বিয়ে হ'লো, তখন আবার আমার মা-বাবা ঠিক সেই রকম করেই লিখলেন, মাসিমা মেসোমশায় আসতে পারলেন না বটে কিন্তু সীতা এলো। বললো, 'তোমার বিয়ে আর আমি আসবো না, ঈশ্. আমি কি তোমাকে একদিনের জন্যও ভুলেছি নাকি?'

আসলে বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা বেড়াতে আসবে এটা আগাগোড়াই ভেবে রেখেছিলো, আমার বিয়েটা প'ড়ে যাওয়ায় সেটাকে জোরদার করার সুবিধে পেলো। এসেছিলো কোনো আত্মীয় পরিজন অথবা প্রতিবেশীর সঙ্গ ধ'রে, থাকলো আমাদের বাড়ি। আর ঐ সময়েই রজত ওকে দেখে একেবারে উদভ্রান্ত। পাত্র সে মন্দ ছিলো না, বি. এস-সি. পাস ক'রে বেশ ভালো একটা কাজে ঢুকেছিলো, চেহারা ভালো, বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। বিমান বললো, 'দাও না ঠিক ক'রে, মন্দ কী?'

আমি বললাম, 'তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, নিজেরাই ঠিক ক'রে নেবে।' তাই নিলো। প্রেমে পড়লো ওরা, তারপর কলকাতা বেড়ানো শেষ ক'রে যাবার সময় সীতার কী কান্না, কী কান্না!

বিয়ে নিয়ে অবশ্য বেশ গোলমাল হয়েছিলো।—প্রথমত বৈদ্য কায়স্তের গোলমাল, তার উপর সীতার মেজদির তখনো বিয়ে হয়নি, উপরন্তু সীতার বাবা কোথা থেকে খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, রজত মদ খায়।

বিমান ভুরু কুঁচকে বললো, 'যত্তো সব গ্রাম্যতা।'

রজত টেবিলে ঘুঁষি মেরে বললো, 'বিয়ে আমি করবোই,'

তারপরই করুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'এই সবিতা বৌদি, যাও না বাপু তুমি একবার ওখানে—।'

'কোথায় ?'

'তোমার প্রাণের মাসিমা-মেসোমশায়ের কাছে বেড়াতে।'

'গিয়ে কী করবো ?'

'প্রথমে ওদের মত করাতে চেষ্টা করবে, রাজী থাকলে ভালো, না হ'লে ওকে বের ক'রে নিয়ে এসো।'

আমি বললাম, 'দেখছো তো, তোমার ভয়ে মেয়েটাকে কলকাতায় এম. এ. পড়তে পর্যন্ত পাঠালেন না, আর আমি যেখানে তোমার বৌদি, আমার সঙ্গে দেবে ?'

'দেবে, ওদের ঘাড় দেবে, একশোবার দেবে।'

'তা হ'লে তুমি মদ ছেড়ে দাও।'

'মদ! শুধু মদ বলছো কী ? আমি সব ছাড়তে পারি ওর জন্য।'

'সত্যি ?'

'নিশ্চয়ই। আর মদ মদ করো কেন বলো তো ? বিমানদা মদ খায় না ? তাই ব'লে তুমি কি অসুখী ?'

'এই চৌত্রিশ বছর বয়সে দেশ-বিদেশ ঘুরে তোমার বিমানদা ও-বিষয়ে যতো না পটু, তুমি কিন্তু তার চেয়ে একটু বেশী। তোমার না-হ'লেই চলে না, বিমানের তা নয়।'

'ঠিক আছে, নিজের স্বামীকে ওরকম সকলেই সাধু দেখে, বিয়ে হ'লে সীতাও তাই বলবে। দয়া ক'রে আমার কেসটা একটু পাকিয়ে দাও লক্ষ্মীটি।'

আমার সমান-বয়সী এই ছেলেটিকে আমি খুব পছন্দ করতাম। আমার সঙ্গে ওর এক সহজ বন্ধুত্ব গ'ড়ে উঠেছিলো, স্বজনবিহীন স্বামীর বাড়িতে এই দেওরটি আমাকে অনেক সম্পর্কের স্বাদ

দিয়েছিলো। ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, বান্ধব যা বলা যায় সব। বিমান আমাদের মানিকজোড় ব'লে ঠাট্টা করতো।

সেই রজত প্রেমের যন্ত্রণায় ছটফট করছে, আমি কি তা কখনও সইতে পারি? মাসিমা মেশোমশায়কে হাতে-পায়ে ধ'রে চিঠি লিখেছিলাম। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনাঃ। তবে ওদের দু'জনের পত্রালাপে যাতে কোনো প্রতিবন্ধক না হয়, সেটা অন্য এক ঠিকানার সাহায্যে ক'রে দিতে পেরে অনেকটা লাঘব হয়েছিলো আমার দুঃখ।

ওরা চিঠিতে চিঠিতে শেষে এটাই ঠিক করেছিলো, রজত একদিন জলপাইগুড়ি যাবে, আগে থেকে দিনক্ষণ তারিখ সব জানিয়ে রাখবে, সীতা সেই মতো প্রস্তুত রাখবে নিজেকে, তারপর সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে আসবে, সোজা কলকাতা। সাবালক মেয়ে, ভয় নেই কিছু, রেজিস্ট্রি ক'রে বিয়ে হবে, আমরা সাক্ষী থাকবো।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ওসব কিছু করতে হ'লো না, মাসিমা মেয়ের চোখের জলে সব সংস্কার ভাসিয়ে স্বামীকে বুঝিয়ে রাজী ক'রে ফেললেন। বেশ ভালোভাবেই বিয়ে হ'য়ে গেলো ওদের। ওরা সুখী হ'লো, আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

তখনই রজত বলেছিলো, সীতা যখন হাসে আমি ত্রিভুবন ভুলে যাই, ওর ঐ গজদন্তটাই ওর আসল চার্ম।

আমি যদ্দূর জানি, রজত ত্রিভুবন ভুলেই কিন্তু পাগল ছিলো সীতাকে নিয়ে, তারপর চাকরি বদল ক'রে-ক'রে দিল্লী গেলো, বম্বে গেলো, আমরাও ঘুরে-ফিরে বার-বার বিদেশে আসতে লাগলুম, যোগাযোগ ছিন্ন হ'য়ে গেলো।

প্রায় চোদ্দ বছর বাদে আমি দেখছি সীতাকে। চেহারা অনেক বদলেছে, আগে গায়ের রং শ্যামলা ছিলো, এখন রীতিমতো ফর্সা। গড়ন বরাবরই খুব সুন্দর, আরো সুসম্পূর্ণ হয়েছে, অতীতের

সারল্যে ভরা বড়ো বড়ো দু'টি চোখে এখন বুদ্ধির দীপ্তি পরিস্ফুট, বোধহয় মফঃস্বলের মেয়ে বলেই কিছুটা ভীরু ভীরু ভাব ছিলো, এখন তা আত্মবিশ্বাসে ঋজু।

এ মেয়ে রজতকে ছেড়ে তখন একদিন একবেলা কাটাতে পারতো না, আর এখন দিব্যি চ'লে এসেছে বারো হাজার মাইল দূরে একা একা? ব্যাপার কী? জিজ্ঞেস করলাম, 'তোর ছেলে মেয়ে কী রে?'

স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে গাড়ির ষ্টিয়ারিং ঘুরোতে-ঘুরোতে সীতা বললো, 'মেয়ে নেই, একটা ছেলে আছে।'

'এখানে?'

'দেরাদুনে।'

'দেরাদুনে কেন?'

'পড়ছে ওখানে।'

'একেবারে বিলিতি কায়দায় মানুষ করছিস?'

'বাঙালী প্রথায় আর করা গেলো কই?'

'গেলো না বুঝি?'

'না। তোমার ছেলেমেয়েদের খবর বলো।'

'আছে, ভালোই আছে। পড়াশুনো করছে সব।'

'সেই অর্জুন, আমি যার নাম রেখেছিলাম, মনে আছে? বম্বে থেকে এসে দেখলাম তখন সে-ই সবচেয়ে ছোটো।'

'এখনো তাই।'

'নামটা কি পাল্টে দিয়েছো নাকি?'

'পাল্টাবো কেন? কী সুন্দর নাম।'

'আমি তো ভেবেছিলাম, ওটাকে নিয়ে আমি পালিয়ে যাবো। কী গাপ্তা গোপ্তা ছিলো।'

'আমরাও ভেবেছিলাম, বিয়ের পরে কতোদিন কেটে গেলো, আর বুঝি তোর ছেলেপুলে হ'লো না। কিন্তু চেহারাটি রেখেছিস

চমৎকার। তোর বয়েস কতো হ'লো ?'

'বলো তো ?'

'একুশ বছর বয়েসে তো বিয়ে করেছিলি, আমি তো দেখছি তারপরে আর এক পা-ও নড়িসনি, তুকতাক করেছিস নাকি কিছু ?'

'তোমাকেও উল্টে আমি সে কথাটাই জিজ্ঞেস করবো ভাবছিলাম।' গাড়ি পার্ক করলো সে, 'এসো, নামি, আর ওপরে ওঠা যাবে না, একটু হাঁটতে হবে।'

নামলাম। মনোরম বাগান ভরা, কুটির ঘেরা, হাসপাতালে ঢুকতে-ঢুকতে নন্দন কাননের আস্বাদ পেলাম। দেখলাম ওখানকার সমস্ত স্টাফ সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলো সীতাকে দেখে, সে রাণীর মতো ঢুকে গেলো কোথায়, একজন নার্সকে ব'লে গেলো, আমাকে হাসপাতালটা ঘুরিয়ে দেখাতে। সেই সুবাদে আমারই-বা কী খাতির।

॥ তিন ॥

ঘণ্টাখানেক বাদে আবার যখন আমরা ফিরতি পথ ধ'রে ডেনভারের দিকে রওয়ানা হলাম, কলোরাডোর পাহাড়ের মাথায়-মাথায় তখন সূর্যের আলো স্তিমিত হ'য়ে এসেছে। রাগত ভঙ্গিতে সীতা বললো, 'দিলো না।'

আমি অবাক হ'য়ে বললাম, 'কী দিলো না?'

'বাচ্চাটাকে। কিন্তু আমি নেবোই, তার জন্য যতোদূর যেতে হয় যাবো।'

সীতার এই উচ্চারণ, আমাকে প্রায় স্তম্ভিত করলো। ছেলেবেলায় সীতার মতো শান্ত নিঃশব্দ মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি, বড়ো হ'য়ে সে তার মা বাবা দিদি দাদাদের ছায়া ছিলো. একটা বয়সে আমার তো নিশ্চয়ই আর বিয়ের পর রজতের। সীতা কোনোদিন নিজের কথা বলতো না, নিজের পছন্দ অপছন্দ চাহিদা কিছুই কখনো বোঝবার উপায় ছিলো না। দেওর বা বন্ধু হিসেবে রজত যতোই চমৎকার হোক না কেন, বিয়ের পরে দেখেছি স্বামী হিসেবে বড়ো জ্বালানে। নিজে কিছু পারে না বা করে না, অবিশ্রান্ত তার সব হাতের কাছে চাই। আগে দিতেন ওর মা, বিয়ের পরে সীতা।

আমরা এলগিন রোডে থাকতাম, আর ওরা থাকতো পার্ক-সার্কাসে। ওর মা বিমানের দূরসম্পর্কের পিশি হ'তেন, আমার যখন বিয়ে হ'লো, ভদ্রমহিলা প্রায় বৃদ্ধা। পাঁচ মেয়ের পরে এই রজত তাঁর শেষ সন্তান এবং একমাত্র পুত্র। দিদিরা সবাই ওর চেয়ে ঢের বড়ো, বিয়ে-থাওয়া হওয়া ঘরণী-গৃহিণী। রজতের মা রজতকে

তাই অতিরিক্ত প্রশ্রয়ে মানুষ করেছিলেন। ফলে বেশ একটু অত্যাচারী স্বভাবের হ'য়ে উঠেছিলো। আমি অবশ্য সেটা ওদের বিয়ের পরেই লক্ষ্য করেছিলাম, আগে নয়। কেননা, আমরা কখনো পার্ক-সার্কাসে যেতাম না, রজতই আপিশের সময়টুকু ছাড়া বাকি সময় আমাদের বাড়িতে কাটাতো। কাজেই ওর ঘরের মূর্তি বা প্রাত্যহিক জীবন যাপন পদ্ধতিটা আমার জানার কথা নয়। কিন্তু সীতাকে বিয়ে কবরার পরে, যাওয়া-আসা-থাকা আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ এসব কয়েকদিন পর্যন্ত এতো বেশী হ'তে আরম্ভ করেছিলো যে দু' বছরে যা জানিনি, ছ'মাসের মধ্যেই তা জেনে ফেলেছিলাম। আর ছ' মাসের মধ্যেই আমাদের একবার সাগর পাড়ি দিতে হ'লো। ফিরলাম দু'বছর বাদে। তখন রজত দিল্লীতে বদলি হয়েছে।

তবু ছেড়ে ছেড়ে বছরে দু'চারবার দেখা হ'তোই, অন্তত যদ্দিন রজতের মা বেঁচেছিলেন, তদ্দিন তো নিশ্চয়ই। সীতা তেমনি শান্ত, তেমনি ভীরু আর ভালোমানুষ। রজত ছাড়া সে জগৎ জানে না। রজত ডাইনে বললে ডাইনে, বাঁয়ে বললে বাঁয়ে। তাছাড়া সীতার ধারণা ছিলো রজতের মতো বুদ্ধিমান যুবক ভূভারতে নেই, সেই বুদ্ধির কাছে সে নিজেকে এতো অকিঞ্চিৎকর মনে করতো যে মুখ ফুটে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে একটা কথা বলবে এমন সাধ্যই তার ছিলো না। বিমান অনেক সময় বলতো, রজতের বৌ এমনিতে যতো ভালোই হোক না কেন, কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, মানুষের ব্যক্তিত্বই তার আসল সম্পদ। সেই সীতার গলায় এতো জোর দেখে, এতো জেদ দেখে আমি যে স্তম্ভিত হবো সে তো নিশ্চয়ই। সীতার ধরণ-ধারণ কথাবার্তা সব কিছুই সেদিন আমাকে বিস্মিত করবার পক্ষে যথেষ্ট ছিলো।

ডেনভারে এসে নির্দিষ্ট জায়গায় আমাকে নামিয়ে দিয়ে সীতা

বললো, 'তা হ'লে আবার সন্ধ্যায় দেখা হচ্ছে?'

আমি বললাম, 'সন্ধ্যায় তো নাচ, তুই কবে আমার কাছে যাবি বল।'

'সন্ধ্যায় নাচ তো কী? নাচের ওখানেই দেখা হবে।'

'ও মা, তুইও যাবি বুঝি?'

'না গিয়ে উপায় কী?' সে হাসলো।

আমি উৎসাহিত হ'য়ে বললাম, 'ঠিক আছে, এক কাজ করি, চল, এখনই তোর জন্য একটা টিকিট কেটে নিয়ে আসি, শেষে যদি না পাওয়া যায়?'

'পাবো।'

'অত সিওর হ'য়ো না, আমার বিদেশীনি বন্ধুটি তো বললো, তখনি প্রায় সব আসন ভর্তি, ওর স্বামীর চেনায় অনেক ব'লে ক'য়ে সামনের দিকে কাল তিনখানা টিকিট অতি উঁচুদামে কিনতে পেরেছে।'

'তিনখানা কেন?'

'ওরা দু'জন আর আমি।'

'আর বিমানদা?'

'বললাম যে ও এখানে নেই—'

'ও। কোথায় গেছেন?'

'নানা প্রোগ্রামে ঠাসা, বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হচ্ছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে।'

'ও।' হঠাৎ যেন ভয়ানক অন্যমনস্ক হ'য়ে গেছে সীতা। সবই বলছে, সবই শুনছে, তবু যেন কিছু বলছে না, কিছু শুনছে না।

'তা হ'লে চলি?'

আমি অস্থির হ'য়ে বললাম, 'চলি কী, বলছি টিকিটটা আগে কিনে আনি—'

'পথে আমি নিয়ে নেবো'খন।'

'আমার তা হ'লে যেতে হবে না সঙ্গে ?'

'না।'

'শোন, যদি টিকিট না পাস তবে আবার কবে—'

'পাই বা না পাই কিছু এসে যাবে না। আজ তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হচ্ছেই।'

'তবু ব'লে রাখি, নাচ শেষ হবে ন'টায়, শুরু সাতটায়—যদি—'

'আমিই তোমাকে বোল্ডারে পৌঁছে দিয়ে আসবো রাত্তিরে।'

'তুই পৌঁছে দিবি ? তুই আমার সঙ্গে যাবি ?' আমি আনন্দে নেচে উঠলাম।

সীতা বললো, 'যদি তুমি ডেনভারে আমার সঙ্গে আজ থাকো, তা হ'লেই সবচেয়ে ভালো হয়। না থাকলে আমিই যাবো।'

'লক্ষ্মী মেয়ে সোনা মেয়ে, আমার কাছেই তুই চল। তোর বিমানদা ফিরুন তখন আমরা তোর বাড়িতে একসঙ্গে আসবো।'

'দশটা চল্লিশ মিনিটে হর্ণ দেবো, প্রস্তুত থেকো।'

'নিশ্চয়ই।'

সীতা তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠলো। আমার যেন মনে হ'লো ওর চোখে আমি জল চিকচিক করতে দেখলাম।

বান্ধবী ইভ আর তার স্বামী ঘরবার করছিলো আমার জন্যে। এতোটা দেরি ভাবতেই পারেনি। বেল টিপতে দৌড়ে এসে বকাবকি করতে লাগলো।

ওরা আমাকে সকালের চা থেকেই চেয়েছিলো। আমি সেটা কাটিয়ে লাঞ্চ করেছিলাম। মনে-মনে ছিলো ইভকে নিয়ে দুপুরের খাওয়া খেয়ে একটু ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে যাবো। তারপর সন্ধ্যায় নাচ। ডিনার সেরে বাড়ি। ওরা ওদের গাড়িতেই দিয়ে আসবে।

ইভ বললো, 'জানো, রীতিমতো চিন্তা হচ্ছিলো।'

হেসে বললাম, 'বাচ্চা নাকি যে হারিয়ে যাবো?'

'বাচ্চা না হ'লেও লোক হারায়।'

'আসলে হ'লো কি জানো—'

'থাক আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।'

'না সত্যি শোনো—' পূর্বাপর বৃষ্টি. ফোন, বন্ধুর সঙ্গে দেখা সব বললাম।

শুনে বিল বললো, 'একটা ফোন তো করতে পারতে?'

'তাইতো। এটা তো আমার খেয়াল হয়নি। ক্ষমা করো। দেশ থেকে মেয়ের ফোন আসছে এ খবরে আমার সব গোলমাল হ'য়ে গেলো।'

'আমরা চারটে নাগাদ একটা ফোন করেছিলাম—'

'তখন তো আমি বেরিয়ে গেছি।'

'যাকগে, দয়া ক'রে এসেছো যে তার জন্যেই অনেক ধন্যবাদ—' বিলের অভিমান আর যায় না।

আমি মনে-মনে ভাবছিলাম, ভাগ্যিস বিলদের সঙ্গে সকাল থেকেই প্রোগ্রাম করিনি, তা হ'লে মেয়ের সঙ্গেও কথা বলা যেতো না, সীতার সঙ্গেও দেখা হ'তো না। মাত্রই কয়েক মাইল দূরত্বের ব্যবধানে বাস ক'রে যদি চ'লে যেতাম সীতাও তখন এখানে ছিলো জানতে পারলে কতো কষ্ট হ'তো।

॥ চার ॥

বিল আর ইভের সঙ্গে আলাপ আমাদের নিউইয়র্কে থাকাকালীন। চমৎকার দম্পতি। কতো যে হুল্লোড় করেছি একসঙ্গে তার ঠিক নেই। গ্রীনিচ ভিলেজে কতো গ্রীষ্মের রাত দল বেঁধে ঘুরে-ঘুরে কেটেছে। বসন্তকালের বিকেলে ইভ ছবি এঁকেছে পথে ব'সে, রাত্তিরে বিল মাটির তলার আধো-অন্ধকার রেঁস্তোরায় গান গেয়েছে আমাদের সুরবাহারের মতো একটা যন্ত্র বাজিয়ে। এরা দুজনরাই ছাত্রছাত্রী ছিলো তখন, সদ্য বিয়ে ক'রে এই গুণ-যোগ্যতার বিনিময়ে রোজগার ক'রে সংসার চালাচ্ছিলো। এরা বেপরোয়া জাতের ছেলেমেয়ে, নিয়মমাফিক জীবনযাপনের অন্তর্গত স্ত্রী-পুরুষ নয়। গান ছবি কবিতা আড্ডা এই ওদের উপজীব্য। বিল রাত্তিরের ক্লাবে তার গভীর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে কবিতাও পড়তো। বেশ ভালো উপার্জন হ'তো দু'জনের মিলে। ইভের আঁকা তাৎক্ষণিক পোট্রেইটগুলো যথেষ্ট বেশী দামে বিক্রী হ'তো।

এই তাৎক্ষণিক পোট্রেইট আঁকা উপলক্ষ্যেই প্রথম আলাপ। ইভ হাসতে-হাসতে জোর ক'রে আমাকে বসিয়ে আঁকতে শুরু করেছিলো। যদিও তখনো আলাপ হয়নি। ঘুরে-ঘুরে ওদের এই বসন্তকালীন ফুটপাতের মেলা দেখছিলাম, শাড়িপরা মেয়ে দেখে ইভ আমাকে পাকড়াও করলো। শাড়ির প্যাঁচানো-প্যাঁচানো ভাঁজ আঁকতে খুব মজা পেয়েছিলো।

তারপরে আলাপ, তারপরে ঠিকানা বিনিময়, তারপরে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ, তারপরে দেখা গেলো বন্ধুতা প্রাত্যহিক মিলনে পর্যবসিত হয়েছে।

এখন আর এরা ছাত্রছাত্রী নেই, দু'জনেই ভালো চাকরি করে। বেশ কিছুকাল আগে কলোরাডোতে এসে স্থায়ী হয়েছে, কিন্তু পথের দূরত্ব মনের দূরত্বে পৌঁছায়নি, আমার স্বামীর এখানে সামার ক্লাশ পড়াতে আসার মূলে বিল আর ইভের অনেক ইচ্ছেই জড়িত। সপ্তাহে তিন দিন বিলও বোল্ডারে ব্যবস্থা-বাণিজ্যের ক্লাশ নিতে আসে। কর্তৃপক্ষের কাছে প্রথম বিলই বিমানকে সামার ক্লাশ পড়াতে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য অনুরোধ করেছিলো। সেই নিমন্ত্রণ পেয়েই বিমান এলো, সঙ্গে আমি।

ওরা কেবল নাচের কথা বলছিলো, পদ্মাসনা ভারতীর রূপগুণের প্রশংসা করছিলো, ওঁর স্কুলের ছাত্রছাত্রী হবে কিনা পরামর্শ করছিলো, আমি সীতার কথা ভাবা ছাড়া অন্য কোনোদিকে মত দিতে পারছিলাম না।

সেই জলপাইগুড়িতে ছেলেবেলাকার কথা, কলকাতায় আমার বাড়িতেই রজতের সঙ্গে ওর প্রথম দেখার কথা, প্রেমের কথা, বিয়ের কথা, সব চোখে চোখে ভাসছিলো। বিল আর ইভ সেই অন্যমনস্কতা লক্ষ্য ক'রে জানতে চাইছিলো আমার কী হয়েছে।

কী হয়েছে তার কোনো ব্যাখ্যা তো আমারও জানা ছিলো না।

যা অনুমান করছি, রজতের সঙ্গে গোলমাল হয়েছে কোনো, তাতেই বা এমন মন খারাপের কী আছে? এদেশে তো রাতদিন দেখছি এ-ব্যাপার। সত্যি তো, মন্ত্র পড়িয়ে দুটো মানুষকে মিলিয়ে দিলেই কি তারা চিরকাল এক হ'য়ে থাকবে নাকি? থাকে যে সেটাই আশ্চর্য! এতোকাল থাকার একটা নির্দিষ্ট কারণ ছিলো, পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েরা চিরদিনই অধীনস্ত। স্বামীরা মেয়েদের কাছে ভর্তা কর্তা প্রভু দেবতা। সেই দেবতার জেদ মতলব ক্রোধ ফরমাস শাসন শাস্তি সবই ছিলো স্ত্রীদের কাছে শিরোধার্য। এখন যেহেতু লেখাপড়া শিখে যতো মুষ্টিমেয়ই হোক, নিজেদের মেয়েরা আর ততো

ছোটো ভাবতে পারছে না, গোলমালটা বেধে উঠছে সেইখানে। আমি বাদক তুমি যন্ত্র, আমি প্রভু তুমি দাসী, আমি ভোক্তা তুমি সেবিকা, এই বিধান আর মেনে নিতে পারছে না তারা। নারী নরকের দ্বার, এটা পুরুষের উক্তি, ঈশ্বরের নয়, এই সত্য তারা বুঝে ফেলেছে।

কিন্তু সীতার মতো শান্ত রজতভক্ত মেয়ের পক্ষে সেসব যেন প্রযোজ্য মনে হচ্ছিলো না। যদি হয়ও তা হ'লেও কেমন বেদনাবোধ হচ্ছিলো ওর আর রজতের দাম্পত্য জীবনের জন্য। তার প্রকৃত কারণই অবশ্য এই যে আমি একজন বাঙালী মেয়ে, আমাদের সংস্কার মরলেও যায় না।

বেলা প'ড়ে এলো, কলোরাডোর পাহাড় রঙিন হ'য়ে উঠলো, খাড়া খাড়া চুড়োগুলো নানান মূর্তিতে দাঁড়িয়ে থাকলো আসন্ন রাত্রির প্রহরী হ'য়ে ভগবানের আঁকা আশ্চর্য ছবির মতো।

নাচে যাবার সময় হ'য়ে এসেছিলো, বিল বললো, 'রাত্তিরে আজ ফিরে না গিয়ে থেকে যাও না আমাদের সঙ্গে।'

ইভ বললো, 'এটা খুব ভালো প্রস্তাব।'

আমি বললাম, 'আমার পক্ষেও ঠিক তাই, কিন্তু সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'বললাম তো দৈবাৎ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গিয়েছে, সে-ই আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলো এখানে, রাত্তিরেও তার গাড়িতে তাকে নিয়েই ফিরবো।'

ছ'টার সময় সেজেগুজে ডিনার সারতে-সারতে কথা হচ্ছিলো, ঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠলাম তিনজনে, সাতটা বাজতে সাত। চলো, চলো, চলো। বিল স্টার্ট দিলো গাড়িতে, ডাউন টাউনেই ফ্ল্যাট, নৃত্যমঞ্চে পৌঁছতে পাঁচ মিনিটের বেশী লাগলো না।

॥ পাঁচ ॥

বাগান পেরিয়ে, কৃত্রিম গিরি গুহা ঝর্ণার পাশে-পাশে হেঁটে হল্-এর বারান্দায় এসে আমি একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। দেহে নয় মনে। সুসজ্জিত শ্বেতাঙ্গ স্ত্রী-পুরুষেরা স্রোতের মতো এসে ভিড় করছিলো, কেউ একতলাতেই ঢুকে যাচ্ছিলো, কেউ সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলো, কেউ অপেক্ষা করছিলো এলিভেটরের জন্য, কেউ বিভিন্ন নৃত্যের ভঙ্গিমায় পদ্মাসনা ভারতীয় ছবি দেখছিলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। আমিও অপলকে ছবিই দেখছিলাম. ইভ বললো, 'হারি আপ এলিভেটর এসে গেছে।'

বিল একটা প্রোগ্রাম কিনে নিয়ে এলো, আমরা গিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় গুছিয়ে বসলাম। দেখলাম সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে রঙ্গমঞ্চ সাজানো হয়েছে, পাদপ্রদীপের সামনে দু'দিকে দুটো আলপনা আঁকা মঙ্গল-কলস, কলসী ঘিরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধূপের ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে উপর দিকে, জায়গাটা পবিত্র গন্ধে ভরপুর, একেবারে পিছনে কালো মখমলের পর্দা পেঁজা মেঘের মতো শাদা চাঁদমালায় শোভিত। শান্তিনিকেতনী নমুনায় কোণ ঘিরে বাটিকের বেঁটে বেড়ার ব্যবধানে সব যন্ত্রীরা গাইয়েরা ব'সে আছে রংয়ের ফোয়ারা হ'য়ে; চার-চারটে তানপুরায় চার চারে ষোলটা তার অনবরত ঝঙ্কৃত হ'য়ে সমস্ত আবহাওয়াটা সুরে-সুরে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে, এইবার ঝমঝম ক'রে বেজে উঠলো বাদ্য। তবলা, সারেঙ্গী জলতরঙ্গ আর সেতার। সমবেত ধ্বনিতে অদ্ভুত একটা জলকল্লোলের আওয়াজ উঠে এলো। শুদ্ধমল্লার না হ'লেও ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাচ্ছে সেই সুর,

সহসা সব ছাপিয়ে ভীমপলশ্রীতে বেজে উঠলো বাঁশী, তখুনি হৃদয় মন মথিত ক'রে আমাদের শ্রবণ আমাদের নিয়ে গেলো যমুনার কূলে, আমরা দেখতে পেলাম মুখে ওড়না ঢেকে, সবুজ কালো কমলা ঘাগরা আর কাঁচুলির ঝলক তুলে চকিত রাধা হরিণীর গতিতে দ্রুতলয়ে নাচতে নাচতে একেবারে চ'লে এলো পাদপ্রদীপের সামনে, কাঁখে পেতলের শূন্য কুম্ভে সোনার ঝলক।

প্রচণ্ড হাততালিতে ফেটে গেলো প্রেক্ষাগৃহ, মুহূর্তের জন্য থেমে পদ্মাসনা ভারতী সুস্মিত হাস্যে গ্রহণ করলো সেই অভিবাদন, তারপরেই আবার চকিত রাধায় রূপান্তরিত হ'য়ে চকিত হরিণীর গতিতে বাঁশীর সুর অনুসরণ করতে করতে সমস্তটা রঙ্গমঞ্চ মন্থন করতে লাগলো।

কী যে সুন্দর সেই নাচ, কী যে পবিত্র, প্রেমে শ্রমে ভক্তিতে কী যে ঐশ্বরিক, অপার্থিব, সত্যি তার কোনো তুলনা ছিলো না। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে এক সময়ে অনুভব করলাম চোখের জলে আমার গাল ভেসে গেছে।

দু'ঘণ্টা ধ'রে চললো সেই নাচ, এক সময়ে আমরা রাধার অভিব্যক্তি থেকেই উপলব্ধি করলাম তার ভগবানকে সে পেয়ে গেছে, শূন্যকে আলিঙ্গন ক'রে একাই সে ওঁ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকলো স্টেজের মাঝখানে, ধীরে ধীরে যবনিকা পতন। হাততালি আর হাততালি। সে আর থামে না। পদ্মাসনা তিনবার এসে দাঁড়ালো, তবু।

এবার বেরুবার পালা। ভিড়ের চাপে বিনা চেষ্টায় কখন যেন এলিভেটর ছেড়ে সিঁড়ি বেয়েই নেমে এলাম নীচে, একেবারে লবিতে। গাড়িতে উঠতে-উঠতে ইভ বললো, 'সুপার্ব', বিল বললো, 'হেভেনলি।' আমি কিছু বললাম না, আমার বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছিলো না।

বাড়ি এসে ওরা অনবরত সেই নাচের বিষয়েই কথা বলছিলো, আমি অপেক্ষা করছিলুম, কখন সীতা আমাকে নিতে আসে।

এলো, সবে একপট কফি নিয়ে বসেছি সবাই, সেই সময়েই নিচে থেকে ফোনে গলা পেলুম ওর, 'আমি এসে গেছি সবিতাদি।'

উঠে পড়েছিলুম, বিল বললো, 'আরে বোসো বোসো, আমি নীচে গিয়ে তোমার বান্ধবীকে নিয়ে আসছি।'

আমি বললাম, 'না বিল, রাত হয়েছে এবার যেতে দাও।'

বলতে গেলে প্রায় ওদের অসন্তুষ্ট ক'রেই নিচে নেমে এলাম। সীতা গাড়ির ষ্টিয়ারিং ধ'রে ব'সে ছিলো, যেতেই নেমে এসে দরজা খুলে ধরলো, আমি উঠে বসলাম, তারপর দু'জনেই চুপ।

শহর ছাড়িয়ে গাড়ি হাইওয়েতে এসে পড়লো, তখনো আমরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিলাম না। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছিলো বাইরে, পাহাড়ের তখন অন্য চেহারা। অনেক পরে সীতা বললো, 'সবিতাদি, তুমি ভগবানে বিশ্বাস করো?'

বাইরে তাকিয়ে আমি বললাম, 'করি। আজ তো তুই ভগবানকে নামিয়ে এনেছিলি।'

সীতা আড়চোখে তাকালো। চুপ ক'রে থেকে বললো, 'খুব অবাক হয়েছো, তাই না?'

'তা তো হয়েইছি।'

'তোমার ভালো লেগেছে?'

'লাগেনি! কিন্তু—'

'সব কিন্তুরই জবাব তুমি পাবে সবিতাদি। আর কেউ না জানুক, তুমি নিশ্চয়ই জানো, আবাল্য আমি তোমাকে যতো ভালোবেসেছি, ততো আমি নিজের দিদিকেও বাসিনি। তুমি তো আমার সুখের সঙ্গী নও, দুঃখেরও সঙ্গী ছিলে।'

'দুঃখ। তখন তোর দুঃখ ছিলো কোথায় ?'

'ছিলো। অনেক দুঃখ ছিলো। আমি আমার শিশুবয়েস থেকেই দুঃখ চিনতে শিখেছিলাম, আমি—আমি—মানে ইংরিজি ভাষায় যাকে বলে আনওয়ানটেড ? ঠিক তাই।'

'কার কাছে আনওয়ানটেড ?'

'সকলের কাছেই। প্রথমত আমার মা বাবা আমাকে চাননি, তবু আমি সংসারে এসেছিলাম, আমার—'

'তুই কী ক'রে জানলি তোর মা বাবা তোকে চাননি ?'

'পর পর আমরা পাঁচবোন যখন জন্মালাম, আমার মা আমাকে দেখে কেঁদে উঠে বলেছিলো, আবারো মেয়ে! দাই তুমি ওকে গলা টিপে মেরে ফ্যালো।'

'বলেছিলেন কিনা জানি না, বললেও তুই শুনলি কী ক'রে ? জন্মানো মাত্রই কি তুই—'

'আমার পরে যখন আমার ভাই হ'লো, দাই তখন একগাল হেসে আমার বাবাকে ছেলে দেখাতে দেখাতে বলেছিলো, এই ছাখো, তোমাদের পঞ্চমীকে দেখে তো তার মা কেঁদে উঠে বলেছিলো, আবারো মেয়ে ? দাই, তুমি ওকে গলা টিপে মেরে ফ্যালো, এখন কি আর বলবে সে কথা ? এই মেয়েই তো ডেকে খুঁজে ভাইকে নিয়ে এলো। আমার বয়েস তখন পাঁচ, আমার চেয়ে অনাদৃত শিশু পাড়ার মধ্যে আর কেউ আছে ব'লে আমার জানা ছিলো না। আমি জীবনে কোনো আব্দার করিনি, অভিমান করিনি, মা বাবা বা দিদি কারো কাছে কিছু চাইনি, সত্যি বলতে তুমিই বোধহয় একমাত্র, শিশু বয়েসে নিঃসঙ্কোচে যার গলা জড়িয়ে ধ'রে আমি চুমু খেয়েছি।'

'এটা তুই ঠিক বলছিস না সীতা, যদি বা মাসিমা ওরকম একটা কথা উচ্চারণ ক'রেও থাকেন তোর জন্মের পরে, সে কথা তিনি মনে রাখেননি, তাঁর বুকে খেয়ে, তাঁর কোলেই তুই বড়ো হ'য়ে

উঠেছিলি। আমাদের সমাজ তো জানিস, মেয়েদের নিয়ে মা বাপকে সর্বদাই নাকের জলে চোখের জলে এক হ'তে হয়, তারা পর হ'য়ে যায়, তারা—'

'সান্ত্বনা দিও না, আর আমার সান্ত্বনার দরকার নেই কোনো।'

'সান্ত্বনা নয় সীতা, সত্য কথাই বলছি।'

'জীবনে কোনটা যে সত্য আর কোনটা নয়, কে বলতে পারে? ভাই হবার পরে আমার অন্য চার বোন সারাক্ষণ তাকে নিয়ে মত্ত হ'য়ে থাকতো, তারা তো আমারো দিদি, কিন্তু মায়ের তাড়না ছাড়া দিদিরা আমাকে কোনোদিন কিছু করেনি, অথচ ভাইকে তারা তোলা তোলা করতো।'

'ওটা তোর অনুমান।'

'আমার শিশু-হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যেতো এই তফাতে। আমি অভিমানে ভাইয়ের দিকে তাকাতে পারতাম না, ঠাকুমা বলতো, হিংসুক। কিন্তু হিংসা নয়, তাকে আমিও কম ভালোবাসতুম না, এক ধরনের বিদ্রোহ বলতে পারো।'

'তোর সীতা নাম কে রেখেছিলো রে?'

'আমার আবার নাম। পঞ্চমী নামেই তো সাত বছর কেটেছে, হঠাৎ আমার ছোটো পিসি এলেন একবার ঢাকা থেকে, বাড়ির হাল চাল দেখে, একদিন বললেন, বৌদি তোমার মেয়ের নাম সীতা থাক। মা বললো, না না সীতা নয়, সীতা জনমদুখিনী, ঐ নাম রাখতে নেই। পিসি বললো, তোমাদের বাড়িতে তো দেখছি পঞ্চমীও জনমদুখিনী, মেয়েটার দিকে তো কাউকে একবার ফিরেও তাকাতে দেখি না, যেন একটা গর্দা মাল। অথচ মেয়েটা কী লক্ষ্মী, আপন মনে থাকে, আপন মনে খেলে, নিজেরটা নিজে সব করে—'

'টুকি পিসির কথা বলছিস?'

'আমার তো দুই পিসি, টুকি আর টুনি। টুকি বড়ো টুনি

ছোটো। আমাদের বাড়িতে টুনি পিসিরও আদর ছিলো না, যেহেতু উনিও মেয়ের পরে মেয়ে।'

'মেয়ের পরে মেয়ে কী রে? মাত্রই তো ছু'জন, বড়ো আর ছোটো!'

'না, বড়ো পিসির আগেও আর একটা মেয়ে হয়েছিলো ঠাকুমার, চার বছর বয়েসে মারা যায়, তারপর বড়ো পিসি, তারপর ছোটো পিসি, তারপর বাবা। বুঝতেই পারছো পরপর তিন মেয়ে দেখে পরিবারের কী দশা!'

'কেন, ওঁরা বুঝি মেয়ে ভালোবাসেন না?'

'না। সত্যি বলতে আমার মাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, মা এতোগুলো মেয়ের মা হচ্ছেন দেখে শ্বশুর শাশুড়ি স্বামী ননদ প্রত্যেকের কাছেই এতো গঞ্জনা সহ্য করেছেন যে, মা হ'য়ে অতি দুঃখেই তিনি আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে বলেছিলেন।'

'তবে তো বুঝিসই।'

'এমন অনেক দুঃখ আছে, যা বুঝে সুঝেও শোধন হয় না। আমাদের বাড়িতে আমার বাবার আর আমার ভাইয়েরই প্রাধান্য। বড়দির কথা তো জানো, সেই কোন যুগে লেখাপড়া না শিখিয়ে তেরো বছর বয়সেই এক বুড়ো বরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ল্যাঠা চুকিয়েছে, এখন বড়দি বিধবা। মেজদিও প্রায় তাই, তবে ইশকুলে ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়েছিলো। অথচ আমার বাবাকে তুমি গরীব বলতে পারবে না, রীতিমতো অবস্থাপন্ন মানুষ, অশিক্ষিতও তো নন, ওকালতি করতে কিছু বিদ্যা-বুদ্ধির দরকার হয় নিশ্চয়ই। তবু তাঁর বিবেচনায় মেয়েরা অন্ত্যজ, পুরুষরাই মানুষ।'

'হ্যাঁ, মেসোমশায়ের এ-দোষটা কিন্তু আমিও লক্ষ্য করেছি। তবে কি জানিস সীতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আধুনিক-অনাধুনিক সব পুরুষদের মনই অল্পবিস্তর এই রোগে আক্রান্ত, এ ওদের বহুপুরুষের ব্যাধি তো?'

'তবু তার মধ্যে ডিগ্রির তফাৎ থাকে, সেটা ফ্যালনা নয়। আমার পিতার পরিবার এ-বিষয়ে অতি অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কী বলবো, আমি আর ছোড়দি তো জোর ক'রে কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। লেখাপড়ায় আমরা দু'বোনেই আমাদের ভাইয়ের চেয়ে বেশী মনযোগী ছিলাম, মেধাবীও বলতে পারো। ছোড়দি ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস করেছিলো, তবু পড়তে দেবে না, বিয়ের জন্য ঘরে বসিয়ে রাখবে। রাখলোও দু'বছর, আমি যখন পাস ক'রে বেরুলাম, আমার সঙ্গে তখন জোর ক'রে কলেজে ভর্তি হ'লো।'

'তোর ভর্তি হওয়া নিয়েও তো গোলমাল হয়েছিলো, মনে নেই? তুই বৃত্তি পেলি, আমার বাবা গিয়ে মেশোমশায়কে বোঝালেন—'

'জানোই তো সব। তারপরে তো আই. এ. পাস করতে না-করতেই ছোড়দির বিয়ে হ'য়ে গেলো, কী পুণ্যে যে আমি বি. এ-টা পাস করতে পেরেছিলাম কে জানে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য আমার বিয়ের জন্য ওঁরা কখনোই বেশী চেষ্টা করেননি, মাথা ঘামাননি। বোধহয় সেটাও এক ধরনের অবহেলা। আমার শাপে বর হ'য়ে গেলো। অবশ্য তার মধ্যে সমাজ সংসারেরও কিছুটা হাওয়া বদল হয়েছিলো। মূর্খ মেয়েকে কোনো শিক্ষিত ছেলেই বিয়ে করতে রাজী নয় তখন, তার উপরে ঠাকুমার মৃত্যু হওয়াতে কিছুটা কর্তৃত্ব নিজে থেকেই আমার মায়ের হাতে এসে পড়েছিলো, বাবা যতোই প্রবল হোন না কেন, বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে মা-ও কিছুটা মুখরা হ'য়ে উঠেছেন, শক্তি সাহস বেড়েছে—'

'থামা, থামা এসে গেছি।'

কথায় কথায় অন্যমনস্ক ছিলাম, ক্যাম্পাসে ঢুকে ওর গাড়ি বাড়ি ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে ছিলো, আমি চেঁচিয়ে উঠতেই সীতা ক্যাঁচ ক'রে ব্রেক কষলো।

॥ ছয় ॥

'বাঃ, কী সুন্দর এ্যাপার্টমেণ্ট তোমার।'

চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই সীতা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো, 'এ-রকম সুন্দর একটা লিভিংরুম তো আমি জীবনে দেখিনি।'

'সত্যি বড়ো সুন্দর এ্যাপার্টমেণ্ট দিয়েছে'—আমি অকুণ্ঠে সায় দিলুম, 'যতো জায়গায় থেকেছি এতো সুন্দর বাড়িতে আর থাকিনি কোনোদিন।'

সীতা ছেলেমানুষের মতো ঘুরে-ঘুরে ঘর দেখতে লাগলো।

'ও মা, দুটো শোবার ঘর? দুটো বাথরুম? এতোগুলো ক্লসেট? এতো বড়ো বাড়ি দিয়ে করো কী তোমরা? ছেলেমেয়েরা তো কেউ সঙ্গে নেই দেখছি।'

আমি সোজা রান্নাঘরে গিয়ে গ্যাস ধরালুম, ইচ্ছে, ডাল ভাত রাঁধি, সীতাকে খাওয়াবো।

'এসেই আবার কী রাঁধতে বসলে?' সীতাও ঘুরে-ফিরে রান্নাঘরে এলো।

আমি হেসে বললাম, 'যা রাঁধবো, খেয়ে তুই অবাক হ'য়ে যাবি।'

'কিছু রাঁধতে হবে না তোমায়।'

'খাবি কী?'

'খাওয়া কি বাকি আছে নাকি?'

'ও, তুমিও তা হ'লে এদের দেখাদেখি ছ'টায় ডিনার সারো, না।'

'তা সারি, কিন্তু দশটা-টশটা নাগাদ আবার খিদে পেয়ে যায়।'

'তবে? এখন তো প্রায় এগারোটা, খিদে পায়নি বুঝি?'

'তাই ব'লে ভাত চাপাচ্ছ কেন? এতো রাতে ভাত খাবে কে?'

'কেন, ভাত তুই খাস না?'

'পেলে যে খাই না তা নয়, ভাত তো আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু কে রাঁধে বলো। আর সময়ই বা কখন?'

'ঐজন্যই আমি আজ তোকে ডাল ভাত খাওয়াবো। কালোজিরে ফোড়নের মুশুরি ডাল, ধনেপাতা দিয়ে।'

'ধনেপাতা! ধনেপাতা তুমি পেলে কোথায়?'

'একটি বাঙালী পরিবার পেয়েছি এখানে, ভদ্রলোকটি বৈজ্ঞানিক, স্ত্রীটি নামেও লক্ষ্মী কাজেও লক্ষ্মী। ওরা একটা একতলা বাড়িতে থাকে. পিছনে সবুজ ঘাসের জমি আছে একটু, কী সুন্দর ধনেপাতা করেছে না—'

'সত্যি? আরে এখানে যে ধনে পাওয়া যায় তাই তো জানি না।'

'যায়, সব পাওয়া যায়, ধনে সর্ষে হলুদ কালোজিরে—'

'তুমি খুব রাঁধো, না?'

'তোর বিমানদার স্বভাব তো জানিস, খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে পুরো বাঙালী।'

'স্ত্রীটিও পেয়েছেন তেমনি। দাবী-দাওয়া মেটাতে তোমার মতো ওস্তাদ আর আমি কাউকে দেখিনি।'

একটা চেয়ার টেনে রান্নাঘরে বসলো সে। আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। তারপর পদ্মাসনা ভারতীকে মেলাতে চেষ্টা করলাম।

'সীতা—'

'বলো।'

'জানতাম তোর অনেক গুণ, কিন্তু—'

'তোমাকে তো বলেছি, তোমার সব কিন্তুর জবাব আমি দেবো, প্রশ্ন কোরো না। আমার আজ যে কী রকম লাগছে তোমাকে দেখে—' সীতা গ্যাসের নীলচে আগুনটার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

আমি একটাতে ডাল অন্যটাতে ভাত চাপিয়ে বললুম, 'চল, বসবার ঘরে বসি গিয়ে, ক'দিন বেশ গরম বেড়েছে, না ?'

'না শীত, না গরম, ভারি সুন্দর আবহাওয়া। ডেনভারের চেয়ে বোল্ডার অনেক বেশী মনোরম।'

'কবে কলকাতা ছেড়েছিস ?'

'কলকাতা! আমি কি কলকাতায় থাকি নাকি ?'

'ভুল বলেছি, তোরা তো বহুকাল প্রবাসী। দিল্লীতে থাকলি, বম্বেতে থাকলি।'

'শেষে কলকাতা এসেই অবশ্য মাথা মুড়িয়েছিলাম—'

'অর্থাৎ সেট্‌ল্ করেছিলি ?'

'যা বলো। আমি মফঃস্বলের মেয়ে আমার কাছে কলকাতাই একমাত্র জায়গা এমন বিধি নিষেধ নেই। রজত কলকাতার জন্যে পাগল ছিলো।'

'নিজের সাধেই তো ছেড়েছিলো সেই শহর।'

'বলো, চাকরির সাধে। চাকরি বদলানো তো ওর একটা রোগ।'

'সেই সঙ্গে জায়গা বদলানো।'

'কাজে কাজেই। বদলে-বদলে কলকাতাতেই পাবে তা তো হয় না। তাছাড়া মাইনেটাও অবিশ্যি মস্ত কথা। দিল্লীর চাকরিটা সত্যি ভাগ্যগুণে পেয়েছিলো।'

'তা-ও বুঝি ভালো লাগলো না ?'

'লাগলো কই ? আবার তো বম্বে দৌড়লো। ওদিকে কলকাতা ছাড়া কোথাও মন টেকে না, তোমরা তো বোধহয় বহুকাল দেশ ছাড়া ?'

'ঠিক বহুকাল নয়। মাঝখানে আমরাও বছরকয়েক দিল্লীবাসী হয়েছিলাম। তবে কলকাতা ছেড়েছি, সত্যিই বহুকাল। কলকাতার কথা ভাবলে আমার উড়ে চ'লে যেতে ইচ্ছে করে।'

সীতা হাসলো, 'গেলে তো উড়েই যাবে, তা আর বেশী কী। ছিক ছিক শব্দ হচ্ছে, তোমার ডাল বোধহয় হ'য়ে গেলো।'

কুকারে আর ক'মিনিট। সত্যি ডাল সেদ্ধ হ'য়ে প্রেশারের মুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছিলো। তাড়াতাড়ি নামিয়ে কল খুলে জলের ধারায় বসিয়ে শান্ত করলাম তাপ, তারপর কড়া ক'রে তেল তাতিয়ে কাঁচালঙ্কা কালোজিরে দিয়ে সম্বার দিলাম. ধনেপাতা কুচিয়ে দিলাম। ভাতও হ'য়ে এলো, সাঁতলানো মাছ ছিলো, সেটা আলুকুচি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে রেঁধে ফেললাম শুকনো শুকনো ক'রে।

রান্না শেষ হ'তে রাত না-বাড়িয়ে খেতে ব'সে গেলাম তাড়াতাড়ি। বস্তুত আমার বিশেষ খাবার ইচ্ছে ছিলো না, রাত্তিরে খাবার অভ্যেস আমার অনেক দিনই নেই ; যৎসামান্য হলেই হ'লো। এরা যেমন সাড়ে ছ'টায় ডিনার খায়, আমরা তেমন প্রায় ঐ সময়ের কাছাকাছিই চা খাই, সাড়ে দশটায় ডিনার। এটা আমাদের কলকাতার অভ্যাস। সে অভ্যাস দূর করবার বিশেষ কোনো কারণ ঘটেনি এইজন্য যে বিমান সব সময়েই এমনভাবে তার কাজের রুটিন ঠিক ক'রে নিতো, যাতে অভ্যাসের সঙ্গে কোনোরকম গরমিল না হয়।

বিমান অনুপস্থিত থাকলে আমি আলস্যবশত রাঁধতামই না নিজের জন্য, সসেজ আইসক্রীমেই আবদ্ধ ছিলো খাওয়া-দাওয়া, কিন্তু সীতার জন্য খুব ইচ্ছে করলো। আমি কোনো পরিশ্রম করিনি বটে, ও তো করেছে? ওর তো সাংঘাতিক খিদে পাওয়া উচিত।

খেয়ে খুব খুশিও হ'লো। ধনেপাতার ডাল খেয়ে আত্মহারা।

বললো, 'ঠাকুমা আমাকে দেখতে পারতেন না বটে, এবং আমিও ঠাকুমাকে, কিন্তু এসব রান্না যে কী চমৎকার রাঁধতেন না—'

'তোর ঠাকুমার রান্না আমারো মনে আছে।'

'একটু-একটু দিতেন তো নিরিমিষ ঘর থেকে, মোটামুটি সবটাই বাবা খেতেন, আর উনিও বাবার জন্যেই দিতেন, কিন্তু আবার নাতিকেও তো দেওয়া চাই, যতো খুদেই হোক সে-ও তো একজন পুরুষ? কিন্তু অতি আদরের স্বেচ্ছাচারী নাতিটি তা মুখে দিয়েও দেখতো না, ওর পাত থেকে নিয়ে আমি আর ছোড়দিই চেটেপুটে খেয়ে নিতাম।'

'আর ওরা?'

'বড়দি, মেজদি, সেজদি? ওদের তো তখন বিয়েই হ'য়ে গেছে।'

'তোর সেজদি কিন্তু খুব সুন্দর ছিলো। আমরা দু'জন প্রায় সমান বয়সী ছিলাম, খুব বন্ধুতা হয়েছিলো একসময়ে।'

'মেজদির খবর তো জানো।'

'কী।'

'কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করেছিলো।'

'কেন রে?'

'শাশুড়ি আর স্বামী একসঙ্গে হ'য়ে যা মারধোর করতো না—'

'সে কী?'

'মেয়েদের জীবনে দুঃখ ছাড়া বোধহয় আর কিছু নেই।' সীতা অন্যমনস্ক হ'লো, একটু হেসে বললো, 'কোন মেয়েদের ভাগ্যবতী বলে জানো তো?'

'কাদের?'

'স্বামীর কাছে যাদের আদর আছে। আর কোন মেয়ে যশোবতী তা-ও নিশ্চয়ই জানো?'

'তুই খুব পুরুষ বিদ্বেষী বুঝতে পারছি।'

'বিদ্বেষ কিছু নয়, যা দেখেছি তাই বলছি। বাবাকে ভালোবাসতাম, কিন্তু বাবার স্বভাবটাকে নয়। মার উপরে তিনি

যথেচ্ছ অত্যাচার চালাতেন। না, মারধোর কিছু না, সেদিক থেকে বাবাকে বরং পত্নী-প্রেমিকই বলা যায়। তার নিজের খেয়াল-খুশি, মর্জি-মতলব, ইচ্ছে-অনিচ্ছে, চাওয়া-পাওয়া, এসব নিয়ে এতো ঝামেলা করতেন যে মা নাকের জলে চোখের জলে এক হ'য়ে যেতেন। বাবার অসহিষ্ণুতার কথা তো তোমরাও জানো।'

'মেশোমশায়ের কিন্তু বেশ নাম ছিলো ভালো লোক ব'লে।'

'ভালো তো বটেই, ভালোর সঙ্গে স্ত্রী অথবা স্ত্রীলোকদের জ্বালাবার তো কোনো সম্পর্ক নেই। তা ছাড়া বাবা উকিল হিসেবে কী পাপ করেছেন বা করেননি তা জানি না, তবে প্রাত্যহিক জীবনে মিথ্যে কথা বলা, ঠকানো, নেশা, চরিত্রহীনতা এসব দোষ আমরা কখনো দেখিনি। যা দেখেছি তা তাঁর পুরুষ-প্রতাপ, যেটা বাড়ির সব মহিলাদের—তার মধ্যে আমাদের পাঁচ বোনকেও ইনক্লুড ক'রে বলছি, সর্বক্ষণ একটা ত্রাসের মধ্যে রেখে দিতো। তিনি বন্ধু নন, সুহৃদ নন, সঙ্গী নন, ভ্রাতা পিতা স্বামী কিছুই নন, প্রথমেই তিনি পুরুষ, মেজাজ মর্জি মিটলে তারপরে আর সব। এটা আর কেউ ভাবতো না, ভাবতাম আমি। শৈশব থেকেই মনে হ'তো আমরা তো সবাই আছি, আর কেউ তো এরকম নয়, বাবা কেন প্রত্যেকটি লোককে শাসন ক'রে বেড়াচ্ছেন ? আমরা না-হয় ছোটো, ছোটোদের বড়োরা অনেক ধমক ধামক ক'রে থাকে। তারা দুষ্টুমি করে, খেলতে থাকলে কথা শুনতে চায় না, সময় মতো চান খাওয়া করতে চায় না, লোভী, আরো কতো দোষ করে, তা ব'লে একজন বড়ো আর একজন বড়োকে আবার ওরকম শাসন করে নাকি ? যেমন ধরো, মা কোথাও যাবেন, বাবার অনুমতি চাই। একবার শহরে কলকাতা থেকে এক নাম-করা থিয়েটার পার্টি এলো, এতোগুলো ছেলেমেয়ের যন্ত্রণায় মা তো কোথাওই বেরুতে পারেন না, এতোগুলো ছেড়ে দাও, এক ছেলের যন্ত্রণায়ই নাজেহাল, বাবা এবং ঠাকুমার অর্ডারই ছিলো ছেলের অযত্ন

হ'লে আর রক্ষে রাখবেন না, কিন্তু সেবার মার এতো থিয়েটার দেখতে ইচ্ছে হ'লো যে বলা যায় না। বাবাকে বললেন, বাবা এক ধমকে বাতিল ক'রে দিলেন। যেহেতু তাঁর নিজের কোনো শখ নেই, অন্যের শখও তিনি সহ্য করতে পারেন না। মা তবু লেগে রইলেন, মুখ কাচুমাচু ক'রে বলতে লাগলেন, 'তুমি যদি না নিয়ে যাও তবে মৃদুলাদের সঙ্গে আমি যাই?' মৃদুলাকে মনে আছে তো, সেই যে বিশ্বাসবাবুর বিধবা বোন, ঐ তো আর একজন। কী দুঃখের ভাতই গিলতে হ'তো রোজ বেচারাকে। মেয়ে বলেই তো?'

'হ্যাঁ সত্যি, আমি মৃদুলামাসির কথা প্রায় প্রায়ই ভাবতাম। কী খাটুনিই না খাটতো সারাদিন, তা-ও বকুনি। বিশ্বাস কাকিমার বছর বছর বাচ্চা হ'তো, আর সব ঝক্কি মৃদুলামাসির।'

'কাকিমা সেজন্য একবার অপারেশনের কথা বলেছিলেন ব'লে অধীর বিশ্বাস প্রায় মারতে বাকি রেখেছিলেন। পাশের বাড়ি তো, চিৎকার ক'রে যা যা বলছিলেন সব শোনা যাচ্ছিলো। তার মধ্যে 'বেশ্যা' শব্দটা কানে এসেছিলো আমার। আমার তখন দশ বছর বয়েস, শব্দটার মানে জানতাম না, উনি বলছিলেন, 'হ্যাঁ, কাটিয়ে কুটিয়ে ফেলে দিলে বেশ্যাবৃত্তি ক'রে এলেও কোনো বাপের ব্যাটা ধরতে পারবে না। বুঝে ছাখো কী অসভ্যতা।'

'অধীর বিশ্বাস অবশ্য বরাবরই অত্যন্ত ক্রুড ছিলেন—'

'অধীর বিশ্বাস সত্যিই ক্রুড ছিলেন, মানি, সেজন্যেই ভাষাটা অমার্জিত। কিন্তু মার্জিত ভাষাবানরাও এ-বিষয়ে বেশ রক্ষণশীল। ঘরে-ঘরে তথাকথিত কতো শিক্ষিত পুরুষেরা কতো অন্যায় করছে স্ত্রীর উপরে তার হিশেব নিলে ছেঁকে ছুঁকে পাঁচজন প্রকৃত ভদ্রলোকও বেরুবে কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

আমি হাসলাম, ওর চুলের লম্বা বিনুনিটা টেনে নিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে, মাসিমা তারপর মৃদুলামাসিদের সঙ্গে থিয়েটারে যেতে

পেরেছিলেন কিনা সেটা বল।'

'মোটেও না। থিয়েটার আরম্ভ সন্ধ্যা সাতটায়, বাবা খাবেন রাত সাড়ে ন'টায়, অতএব মা কী ক'রে যান? তখন বড়দি শ্বশুরবাড়ি থেকে আমাদের এখানে এসেছেন, বড়দির বাচ্চা হবে, শরীর ভালো না, রাত জাগতে পারবে না, তাই বড়দি থাকছিলো। প্রকৃতপক্ষে বড়দির কাছে আমার ভাইকে রেখে যাবার সুবিধে ছিলো ব'লেই মা যাবার কথা তুলেছিলেন, নইলে তো কুরুক্ষেত্র লেগে যেতো। গৃহস্থ ঘরের বৌঝির আবার অতো থিয়েটার বায়োস্কোপের শখ কেন, বাজারের মেয়েছেলেদের মতো অতো নাচুনেপনা কেন,—এই সব ভদ্রলোকের মার্জিত ভাষা প্রয়োগ করেই বাবা মাকে সাত হাত জলের তলায় ঠেলে দিতেন, তাই সে রাস্তা পাকা ক'রেই মা হেঁটেছিলেন। তবুও ফাঁক থেকে গেলো, বাবার খাবার সময় হন্তদন্ত হ'য়ে বাবার ক্রীতদাসীটি যদি ঘর্মাক্তই না হলেন তবে আর বিয়ে করা কেন?'

বড়দি বললো, 'মা যাক বাবা, আমি তো আছি, আমি খেতে দেবো।'

'না না, তুই পারবি না।'

'না পারার কি আছে, কী এমন কঠিন কাজ? আমি সব ঠিক ক'রে রেখে যাবো!' মার বিনীত গলা মিন মিন করলো।

বাবা খেঁকিয়ে উঠলেন, 'যাবেই যদি তবে আর জিগেশ করতে এসেছো কেন? বিরক্ত কোরো না। আমার কাজ আছে।'

মার অভিমান হ'লো, কাঁদতে-কাঁদতে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি তখন বেশ বড়ো, ক্লাশ এইটের ছাত্রী, গোগ্রাসে বই গিলি, বলাই বাহুল্য গল্প উপন্যাস, এবং এও বলা বাহুল্য সবই লুকিয়ে। কেননা একটা তেরো বছরের মেয়ে বড়োদের উপন্যাস পড়ছে এর চেয়ে ভয়ঙ্কর কথা আমার বাবার কাছে আর কিছু ছিলো না। তা হ'লে চরিত্র খারাপ তো অনিবার্য। চরিত্র, চরিত্র, চরিত্র, মেয়েদের চরিত্র

নিয়ে উৎকণ্ঠা পুরুষদের আর এক ব্যাধি। যাই হোক, অত বই পড়ার ফলেই বোধহয় আমি বয়সের তুলনায় অনেকটা পরিণত ছিলাম। প্রথম কথা, যেটা আমার বেশী অস্বাভাবিক মনে হ'লো, মা একজন বয়স্ক মানুষ হ'য়ে, ঠিক আমাদের মতো ভয়ে-ভয়ে তারই কাছাকাছি বয়সের আর একজন মানুষের কাছে অনুমতি চাইতে গেলেন কেন? যাবেন তো যাবেন, এর মধ্যে অত কিন্তু কিন্তু করার কী আছে? সাংসারিক কারণে যদি অসুবিধে ঘটে তবে তো বাবার চেয়ে মা নিজেই ভালো বুঝবেন। দ্বিতীয় কথা, বাবা তো কখনো মার অনুমতি নিয়ে কিছু করেন না বা কোথাও যান না? সমান বয়সীদের মধ্যে সবই পারস্পরিক হওয়া উচিত। কিন্তু বাবার বেলায় সব তা হ'লে অন্য রকম কেন? যদি বাবার সখ হ'তো 'চলো' অথবা 'চললাম' বললেই যথেষ্ট ছিলো। সেই আমি প্রথম প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করলাম, এই ব্যবধান, স্ত্রী পুরুষের ব্যবধান। মা স্ত্রীলোক ব'লেই শাসিত জীব, বাবা পুরুষ ব'লেই শাসক। বলো ঠিক কিনা?'

'হয়তো।'

সীতা মাথা ঝাঁকালো, 'না হয়তো নয়, এড়িয়ে যেয়ো না, যা সত্য তা বলো।'

আমি চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'অকপট সত্যটা কি জানিস, মেয়েরা তো আর্থিকভাবে স্বাধীন নয়, সেখানেই তাদের আসল পরাজয়।'

'অর্থাৎ তারা পরমুখাপেক্ষী, তাই তো?'

'আর তো আমি কোনো কারণ দেখি না।'

'কিন্তু পরমুখাপেক্ষীই বা কেন বলছো? স্বামী কি পর?'

'নিজে ছাড়া সবাই পর।'

'এ তুমি ঠিক বললে না। দু'জনরা বিয়ে করে, সংসার পাতে, সন্তান হয়, স্বার্থ এক হ'য়ে যায়, তবে এই সংঘাত কেন? যদি

পূর্বাপর ভেবে ছাখো, তা হ'লে স্ত্রীপুরুষের 'ডিভিসন অব লেবার'টা তো খুব প্রযোজ্য। পুরুষেরা বলবান, সে বাইরে গিয়ে খাটবে পিটবে আহার্যের বন্দোবস্ত করবে, মেয়েরা স্বল্পবোন, কোমল, তাদের উপর ভগবান সন্তান বহনের ভার দিয়েছেন, লালন-পালনের ভার দিয়েছেন, বুকে শিশুর খাদ্য দিয়েছেন, তাদের তো এমনিতেই ঘরে আবদ্ধ থাকতে হয়। পুরুষ যা এনে দেয় তা সুষম বণ্টন ক'রে সংসার চালাতে হয়। রক্ষা করতে হয়, পরিচর্যা করতে হয়—'

'এই তো তুই নিজেই যুক্তিতেই নিজে হেরে গেলি—'

'কেন?'

'বললি না, মেয়েদের সন্তান বহন করতে হয়, জন্ম দিতে হয়, লালন-পালন করতে হয়, আমি তো বলি মেয়েদের উপর ঈশ্বরের এই অপক্ষপাতের জন্যই মেয়েরা ম'রে আছে। পুরুষরা এখানেই তাদের পায়ের তলায় রেখে দিয়েছে।'

'তুমি আরো গভীরে ভেবে ছাখোনি তাই এসব বলছো। ঈশ্বরের পরিমিতি বোধ আশ্চর্য, অনন্য অতুলনীয়। তিনি বুঝেসুঝেই এটা করেছেন। একটা বলিষ্ঠ পুরুষকে দশমাস গর্ভ দিয়ে ঘরে বসিয়ে রাখলে আরো চোদ্দমাস লালন-পালনের জন্য অন্তরীণ করলে ঐ নরম-নরম মেয়েরা তো তিনদিনেই সাপ বাঘ আর অন্য পুরুষের কবলাকৃত হ'য়ে মারা যাবে। বাইরে উপার্জন করতে বেরুবার মতো শক্তি তো তাদের দেননি ঈশ্বর। বাইরের যুদ্ধ মজবুত মানুষের, ঘরের শৃঙ্খলা কোমল মানুষের, এই হচ্ছে তার বিধান। যেহেতু দেহ বড়ো সেই হেতু আসুরিক বৃত্তি গ্রহণ করবে, পরমপুরুষ এ-কথা ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করেননি, করলে দু'জনদেরই সমান মজবুত অথবা সমান কোমল ক'রে পাঠাতেন। আরো একটা কথা, মেয়েরা মানুষ হিসেবে অনেক বেশী সম্পূর্ণ, তারা পশুর মতো অথবা পুরুষের মতো কর্কশ নয়, নিষ্ঠুর নয়, উদাসীন নয়, উগ্র নয়, কামুক বা লোভী কিছুই নয়,

তাদের মনের তার অনেক উঁচুতে বাঁধা, তারা কাঁদতে জানে, ভালো-বাসতে জানে, মায়া মমতা স্নেহ—সমস্ত সূক্ষ্মবৃত্তিই তাদের মনুষ্যত্বের প্রমাণ। রেঁধে বেড়ে স্বামী সন্তানকে খাওয়ানো কি খারাপ? রোগে শোকে সকলের শুশ্রূষা কি অপমানের? শ্রান্ত পুরুষকে সেবা করা কি নিচু কাজ? কিন্তু কেন সেটাকে পুরুষ এভাবে নিলো? কেন মেয়েদের তারা অন্ত্যজ ক'রে রাখলো, কেন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য আর অবহেলায় তাদের চেপে রাখলো তলায়? মেয়েরা তো ভিক্ষার ভাত খাচ্ছে না, কাজ তো তাদেরও আছে। তা হ'লে একজন স্ত্রী কী হিশেবে তার স্বামীর মুখাপেক্ষী? বরং নারী পুরুষের কাজের বিচার করলে দেখা যাবে মহৎ কাজের ভারটা ভগবান নারীর উপরেই দিয়ে পাঠিয়েছেন। মানুষ তৈরীর কারখানা হিশেবে তাদের উদর, উদার হৃদয় আর উৎসর্গীকৃত সত্তার কি কোনো তুলনা আছে?'

আমাদের খাওয়া হ'য়ে গিয়েছিলো, কথা বলতে-বলতে সময়ের খেয়াল ছিলো না, এক সময়ে সীতাই উঠে পড়লো, জোর ক'রে বাসন তুলে নিয়ে যেতে-যেতে বললো, 'হাত ধুয়ে বিছানা ঠিক করোগে যাও আর তোমাকে আমি রান্না-ঘরের কাজে হাত দিতে দিচ্ছি না, সামান্য তো দু'টো প্লেট গ্লাশ আর প্রেশার কুকার, আমি এক্ষুনি মেজে ঘ'ষে পরিষ্কার ক'রে চ'লে আসছি, তারপর আবার শুয়ে শুয়ে গল্প। আসল গল্পটা তো এখনো শুরুই করিনি'—চোখের কোলে ম্লানভাবে হাসলো সে।

॥ সাত ॥

ক্যাম্পাসের পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে বারোটা বাজলো। ফুটফুটে চাঁদ উঠলো দূর পাহাড়ের মাথায় শোবার ঘরে সমস্তটা পুব জুড়ে কাচের জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না উপচে পড়লো মেঝেতে। নীচে জানালার তলায় চৌকো সবুজ লন, লন ঘিরে ফুলের বিছানা। বাগানে সারা রাত আলো থাকে, চাঁদের আলো সেই আলোকে নিষ্প্রভ ক'রে দিচ্ছিলো।

সামান্য কাচাকুচি ছিলো। এ-বাড়িতে ওয়াশিং মেশিন নেই, সেটা একটা অসুবিধে। প্রতিবেশীনিরা যদিও তাদের বাড়ি গিয়ে কেচে আসতে বলে, আমি যাই না, গরম জলের কল খুলে বাথটবের মধ্যেই ভিজিয়ে দিই খানিকক্ষণের জন্য, একটু চেপে নিলেই হ'লো। তারপর নিংড়ে মেলে দেওয়া। আমার তাতেই সুবিধে হয়। সেখানেও সীতা হাত লাগাতে এসেছিলো, তুই ধমক খেয়ে চ'লে গেলো। আলো নেবানো শোবার ঘরের জ্যোৎস্না দেখে সীতা ভারি খুশি। তারপরেই বিছানায় উপুড় হ'য়ে প'ড়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

ঘরে মুখোমুখি দুটো খাট, মাঝখানে নিচু টেবিল, টেবিলে বাতি, নিচে তাক আছে বই রাখার, খোপ আছে জল রাখার, অন্য খাটে ব'সে আমি নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলুম, কাঁদতে দিলুম সীতাকে, কোনো ঘটনা না জেনে আমারও কান্না পাচ্ছিলো। অল্প পরেই শান্ত হ'য়ে সীতা উঠে চ'লে গেলো বাথরুমে, স্নান ক'রে এলো। কানের

পিঠের জল মুছতে মুছতে বললো, 'এ-দেশের এই গরম জলে রাত্রি-বেলার স্নানটা আমার এতো ভালো লাগে!'

'তুই কদ্দিন এদেশে আছিস?'

'থাকি না তো, যাই আর আসি।'

'যাস আর আসিস?'

'স্কুল আছে যে, বছরে ছ'মাস-ছমাস ধরতে পারো।'

'মানে, দেশে ছ'মাস, এখানে ছ'মাস?'

'হ্যাঁ।'

'দেশে কোথায় থাকিস?'

'মাইসোরে। অনেকদিন আছি।'

'কতোদিন?' আমি সোজা চোখে তাকালাম, সেও চোখ নামিয়ে নিলো না, শান্ত গলায় বললো, 'বারো বছর।'

'তার মানে বারো বছর যাবত তুই রজতকে ছেড়েছিস?'

'হ্যাঁ।'

একটা গেরুয়া রংয়ের হাওয়াই শোবার পোশাক পরেছিলো সীতা, এতো সুন্দর দেখাচ্ছিলো যে আমি অবাক হ'য়ে আগের সীতাকে মেলাবার চেষ্টা করছিলাম। হিশেব মতো ওর বয়স এখন বিয়াল্লিশ হওয়া উচিত, কিন্তু দেখাচ্ছিলো একটি কাঁচা চব্বিশ বছরের মেয়ের মতো। নেচে-নেচে শরীর এমন সুঠাম হয়েছে যে পিঠ কোমর সব যেন পাথর কেটে তৈরী। মনে হ'লো মানুষের বয়সটা কিছু না, জিনিশটা টেঁকসই কিনা সেটাই আসল। এই সীতা তো নতুনের কান কাটে, তবে আর বয়সের হিশেবে দরকার কী?

সে আরাম ক'রে হাত-পা ছড়িয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়লো। বললাম, 'মাসিমা মেশোমশায় কেমন আছেন রে?'

'মা আছেন কোনোরকমে, বাবা নেই।'

'নেই? কবে গেলেন?'

'তা, বেশ কয়েক বছর তো হ'লো।'

'মাধব? মাধবের খবর কী?' মাধব ওদের একমাত্র ভাই।

'জলপাইগুড়ির বাড়ি-টাড়ি বিক্রী ক'রে বাবার উপার্জনের অনেক সঞ্চয় দিয়ে এখন তো কলকাতাতেই বসবাস।'

'তাই বুঝি?'

'আদরে-আদরে তো মাথাটি খেয়েছে সবাই, শেষ পর্যন্ত বি. এ-টাও পাস করলো না, অবশ্য পৈতৃক বিত্ত কম ছিল না কিন্তু ব'সে খেলে আর ক'দিন?'

'চাকরি বাকরি—'

'কিচ্ছু না।'

'ঘুমুবি? আলোটা নিবিয়ে দেবো?'

'ঘুমুই না ঘুমুই আলো তুমি নিবিয়েই দাও। নকল আলোতে কী হবে? দেখছো তো আজ আসল আলোর কত জোর? সবিতাদি, এমন এক জ্যোৎস্নারাত্রেই আমি ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছিলুম।'

'পথে!'

'জানো তো রজতকে বিয়ে করার জন্য এমন কোনো কাজ নেই যা আমি করতে না পারতুম, রজতেরও নিশ্চয়ই তা-ই ছিলো। বিয়ে নিয়ে বাড়িতে কী হাঙ্গামা, আগে বাবার কাছে এসব চাপা-চাপা ছিলো, জানতে পারার পর থেকে আমাকে একেবারে আটকে দিলেন বাড়ির মধ্যে, তা দিন, বাড়ি থেকে বেরুবার অভ্যেস খুব ছিলোও না আমার। যে ইচ্ছেটা পিষে দিলেন সেটা হচ্ছে, এম. এ-তে ভর্তি হওয়া। কী জানি কী কারণে, আমার পড়াটাতে বাবা শেষ পর্যন্ত খুব আপত্তি করছিলেন না। আমি যখন বি. এ. পাস করলাম, দিদিরা সবাই বিবাহিত, ছোড়দিও। বাড়ি বলা যায় একেবারে খালি, আমি আর মাধব, বাবা আর মা, আর ঠাকুমাতো তখন আজ যান কাল যান। গেলেনও তাই। হয়তো বাবার খুব ফাঁকা-ফাঁকা

লাগতো বাড়িটা, চিরকাল কোনো-না-কোনো মেয়ে হাতের কাছে থাকায়, কাজকর্মেরও সুবিধে ছিল অনেক, একেবারেই কেউ থাকবে না সেটা ভাবতে হয়তো ভালো লাগতো না, আর বয়েস তো শুধু বাবারই হয়নি, মারও তো পাক ধরেছে চুলে, কাজেই তাঁর দ্বারা আগের মতো স্যুইচ টিপলেই যেমন আলো, তেমনি দ্রুত কাজ পাবেন এমন আশাও সুদূরপরাহত, যে কারণেই হোক আমাকে তখুনি পার করার জন্যে ব্যস্ত ছিলেন না। বি. এ. পাস করার পরে সত্যি কলকাতা পাঠিয়ে এম. এ. পড়াবেন সেটা খানিকটা অলীক কল্পনা ছিলো বটে, তবে পড়ান না পড়ান তক্ষুনি যে বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লাগবেন না তা জানতাম। লাগলেন ঘটনাটা জানবার পরে। হুঙ্কারে বাড়িঘর ফাটিয়ে দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলেন কাগজে। এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হ'য়ে স্থির করলেন এক পয়সা তিনি খরচ করবেন না এই ব্যাপারে, বি. এ. পর্যন্ত যে পড়িয়েছেন, সে পয়সার জন্যই তখন তাঁর অনুশোচনা। নিজের বর নিজে পছন্দ করার মতো অসচ্চরিত্রতাই তো একটা মেয়ের পক্ষে ভয়ানক পাপ, তার উপরে অসবর্ণ বিবাহ?'

আমি অবাক হ'য়ে বললাম, 'মেশোমশায় তোকে আটকে দিয়েছিলেন? জানি না তো।'

'আটকে দেয়াটা তো কিছু না, কতো মেরেছেন তা কি জানো?'

'মেরেছেন?'

'বিজ্ঞাপনে ছিলো, মেয়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম, সুশ্রী, পাত্রপক্ষের কোনো দাবী পূরণ করতে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম, এ-অবস্থায় যে পাত্র বা পাত্রের কর্তৃপক্ষ রাজী থাকেন তারাই চিঠি লিখবেন।'

'তা হ'লে তো আমাদের দেশে কোনো পাত্রই পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।'

'বাবা অবশ্যই তোমার চেয়ে একটু বেশী বুদ্ধিমান। তিনি

জানতেন, হাবা গোবা, বয়স্ক, বিপত্নীক, কুৎসিত, খুঁতসম্পন্ন নিচুজাত —এ ধরনের বহু লোকের কাছে এই আবেদন গ্রহণযোগ্য। কার্যত দেখাও গেলো তাই। অনেক চিঠিই এলো, এবং যে সমস্ত লোক ক্রমাগত দেখতে আসতে লাগলো—'

'ক্রমাগত!'

'তা ক্রমাগতই বলা যায় এক রকম। ছ' মাসে পাঁচটা পার্টি এসেছিলো, সেই সময়ে মা অবশ্য আমার হ'য়ে অনেক লড়েছিলেন, হাজার হোক মা তো, সন্তানের কষ্ট বা অমঙ্গল সহ্য করা কিছুতেই সম্ভব না তাঁর পক্ষে। বাবা ক্রোধবশত মনস্থির করেছেন, হাত-পা বেঁধে জলে ফেলবেনই ফেলবেন, যে-কোন একটা লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে স্বেচ্ছাচারিতার শোধ তুলবেন। মা কিছুতেই রাজী নন, বিনি পয়সায় যারা বৌ নির্বাচন করতে এসেছিলো মা কেঁদে-কেটে ঝগড়াঝাঁটি ক'রে কারো সঙ্গেই বিয়ে দিতে দিলেন না।'

'তুই নিজে কী করছিলি? তোর কোন মেরুদণ্ড ছিলো না বাধা দেবার? লেখাপড়াও তো শিখেছিলি কিছু, বয়সেও নাবালিকা ছিলি না—' আমি উত্তেজনায় ন'ড়ে চ'ড়ে বললাম।'

সীতা বললো, 'মেরুদণ্ড ছিলো সবিতাদি, প্রয়োগ করার বিদ্যেটা জানা ছিলো না। যাকে বলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, সেটা আমি কখনো পারতাম না। আমার যতো রাগ সব মনে-মনে নিজেকে শাস্তি দিয়ে, লোকগুলো যখন দেখতে আসতো, আমি দাঁতে দাঁত আটকে এক অদ্ভুত জেদ নিয়ে গিয়ে বসতাম সামনে, কিন্তু কোন কথার জবাব দিতাম না। ওরা চ'লে গেলে বাবা তা নিয়ে গালিগালাজের বন্যা ছুটিয়ে দিতেন, তখনো তেমনি নিঃশব্দ দেখে এমন জোরে চড় মারতেন যে আমি উল্টে পড়ে যেতাম। এই চড় মারা ব্যাপারটাই মাকে তাঁর ভয় ভীতি ভুলিয়ে প্রথমে ক্ষিপ্ত করে, সেই প্রথম তিনি বাবার বিরুদ্ধে উঁচুগলায় প্রতিবাদের ঝড়

তোলেন। রাগ সামলাতে না পেরে মার গায়েও বাবা হাত তুলেছেন দু' একবার, আমার খাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়েছেন, আমাদের মা-মেয়েকে বাড়ি থেকে ঘাড় ধ'রে বার ক'রে দেবার ভয় দেখিয়েছেন, কী বলবো তোমাকে, সে সব দিনের কথা ভাবলে এখনো আমার কান্না পায়।'

'তারপর ?'

'তারপর আমি নিজেই একদিন বাবার আপিশ ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম, কাজ করছিলেন, মুখ তুলে তাকিয়েই ঘৃণাভরে ফিরিয়ে নিলেন মুখ।'

'তারপর ?'

'আমি বললাম, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। বাবা বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা নেই।' আমি বললাম, আমি তো বলিনি তোমার আমার সঙ্গে কথা আছে, আমি বলেছি আমার তোমার সঙ্গে কথা আছে। একথায় একটু বোধহয়, হকচকালেন। মেরে ফেললে, কেটে ফেললেও যে শব্দ করে না, তার এই ব্যবহারটা বোধহয় ঠিক বোধগম্য হচ্ছিলো না। গাম্ভীর্য বজায় রেখে যেমন কাজ করছিলেন, তেমনিই কাজ করতে লাগলেন। আমি আমার বক্তব্য পরিষ্কার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলুম তাঁকে। বললুম, তুমি যা চাও তা হবে না, আমি যা চাই তাই হবে।'

'কী তুমি চাও ?' চিৎকার ক'রে টেবিলে তিনি মুষ্ট্যাঘাত করলেন। আমি বিচলিত না হ'য়ে বললুম, তোমার শরীরে শক্তি আছে, গলার জোর আছে, সবই আমি জানি, কিন্তু তুমিও জেনে রেখো, তা খাটাবার আধিপত্য তোমার স্ত্রীর উপর আছে ব'লে মেয়ের উপর তা খাটবে না।'

'কী বললি !' চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

আমি বললাম, যা বলেছি তা তুমি শুনেছ, যা শোনোনি তা

হচ্ছে এই, আমার বিয়ে নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না, আমাকে খেতে পরতেও দিও না, শুধু দরজাটা খুলে দাও, আমি বেরিয়ে যাই।

'বেরিয়ে যাই! আমার মুখের উপর তোমার এতো বড়ো কথা? এতো স্পর্দ্ধা তোমার—'

আমি বললাম, স্পর্দ্ধা আমার নয়, স্পর্দ্ধা তোমার। স্পর্দ্ধার উপর ব'সে ব'সেই তুমি জীবন কাটিয়েছো, নইলে কোনো ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী-কন্যার গায়ে হাত তোলেন। মার কোনো উপায় নেই, আমার আছে। আমি তোমার আশ্রয়ে থাকবো না।

বাবা ছুটে আমাকে মারতে এসেছিলেন, আমি আমার সমস্ত শক্তি গলার মধ্যে সংহত ক'রে সাংঘাতিক জোরে চেঁচিয়ে বললুম, খবরদার! আর তুমি কোনোদিন আমার গায়ে হাত তুলবে না, তা হ'লে আমিও তার প্রতিদান দেবো।

'কী করবি, কী করবি তুই আমাকে? আমাকে মারবি! আমি তোকে কেটে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবো, কুকুর দিয়ে খাওয়াবো—'

বললুম, তা তুমি পারো, তোমার যে হৃদয় ব'লে কিছু নেই, আমার চেয়ে কে তা বেশী জানে? কিন্তু অতদূর যাবে কেন? একটা খুনের মামলা থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে? তার চেয়ে সহজ উপায়, এখন বাড়িতে আটকে রেখেছো, এরপর ঘরের মধ্যে ভ'রে দিয়ে তালা বন্ধ ক'রে রেখে দাও, খেতে দিও না, মেরে ফেলো তিল তিল ক'রে, কিন্তু তবু জেনো, আর আমি কোনো পাত্রপক্ষের সামনে নিজেকে নিয়ে বসবো না, তোমার ইচ্ছেমতো, কথামতো কাউকেই বিয়ে করবো না। সেখানে তুমি তোমার ইচ্ছে খাটাতে কোনো-রকমেই পারবে না, এ-কথাটাই জানাতে এসেছি। বাবার দিকে আমি পলকহীন ভাবে তাকিয়ে কথা বলছিলাম, মনে হ'লো বাবা সেই দৃষ্টি সহ্য করতে পারছিলেন না, হঠাৎ রেগে বেরিয়ে গেলেন।

গোলমাল শুনে রান্নাঘর থেকে মা ছুটে এসেছিলেন, ভয়ার্ত গলায় বললেন, 'আবার কী হ'লো? তোর বাবা কোথায় গেলেন?'

আমি বললাম, আমাকে জানিয়ে যায়নি। এই ব'লে ঘর থেকে উঠোনে এসে তাকালাম চারদিকে, বাইরের দরজাটা খোলা ছিলো, আমার প্রহরী আমার ভাই আর নেপালি দারোয়ান মনবাহাদুর, কেউ উপস্থিত ছিলো না, আমি সেই সুযোগে বেরিয়ে পড়তে পারতুম বাড়ি থেকে, যদিও বেরিয়ে কোথায় যেতুম তা জানি না, এবং এও জানি ঐটুকু শহরে ধরা পড়তে সময় লাগতো না বেশী, তবুও পা বাড়িয়েছিলুম, অন্তত ইষ্টিশনে গিয়ে রেলের তলায় তো কাটা পড়তে পারি? মার জন্য ভীষণ কষ্ট হ'লো, আর সবচেয়ে আশ্চর্য কী জানো?

বাবার জন্যেও। ধীরে ধীরে উঠোন থেকে ঘরে ফিরে এলাম।

বাবা ফিরলেন অনেক বেলায়। মা ব্যস্ত হ'য়ে উদ্বিগ্ন হ'য়ে বারে বারে আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, 'কী হয়েছে।' আমি বলেছিলাম কিছু না, এমনি করতে করতেই বাবার চটির আওয়াজ পাওয়া গেলো। চুপচাপ, শান্ত, গম্ভীর। ভেবেছিলাম, এর পর কী জানি কী হয়। আমি সব শাস্তি নিতেই প্রস্তুত ছিলাম। সেই মর্মে রজতকে চিঠিও লিখে দিয়েছিলুম একটা; জবাবে রজত লিখেছিলো, 'আমি যাবো, আমি জোর ক'রে নিয়ে আসবো তোমাকে তার জন্য কোন বাধাই আমার কাছে অনতিক্রম্য হবে না, শুধু তুমি সম্মত কিনা সেটা জানাও।'

'রজত তোকে অনিমেষের ঠিকনাতেই চিঠি লিখতো না?'

· 'হ্যাঁ।'

'কেউ টের পায়নি কখনো?'

'না।'

'সেই অনিমেষদা আমার বিয়ের অল্প আগে টাইফয়েডে মারা গেলেন।'

'শুনেছিলাম। এতো খারাপ লেগেছিলো!'

'চিরকাল সকলের উপর একাধিপত্য করতে-করতে বাবা ভেবেছিলেন, একাই তিনি সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর মতের বিরুদ্ধে কেউ যে একটা কথা বলতে পারে এ ছিলো তাঁর ধারণার অতীত। সহসা সেখানে একটা মস্ত আঘাত খেলেন, আত্মবিশ্বাসে তাঁর চিড় ধরলো। আমার ঔদ্ধত্য তাঁকে ভীতু করে তুললো। তিনি হেরে গেলেন। তারপর দেখলাম কখন যেন সদর দরজা থেকে প্রহরী উঠে গেছে, বাড়ি থেকে আগুনের হাওয়া উধাও, বাবা নিস্পৃহ। সেই সুযোগে সংসারটা মার মুঠোয় এসে গেলো সকলের সম্মতিক্রমেই শেষে বিয়ে হ'য়ে গেলো আমার।

॥ আট ॥

এক দমকে এতো কথা ব'লে চুপ করলো সীতা। আস্তে আস্তে চাঁদ সরে যাচ্ছিলো, ডুবে যাচ্ছিলো পাহাড়ের কোলে, ঘরের মধ্যে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছিলো, দুই বিছানায় দু'জনে দু'জনকে আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছিলুম, হঠাৎ সীতা উঠে ব'সে হাত বাড়িয়ে ড্রেসিং টেবিল থেকে চিরুণী এনে ঘষর ঘষর চুল আঁচড়াতে লাগলো।

'এই গেলো আমার জীবনের প্রথম অধ্যায়। কিন্তু রজতকে বিয়ে ক'রে আমি যতো সুখী হয়েছিলুম, সেই সুখের কাছে আমার অতীত জীবনের সমস্ত দুঃখ বেদনা কোথায় ভেসে গেলো।'

চুল আঁচড়ানো শেষ করতে-করতে সীতা আবার কথা বলছিলো। আমি উৎকর্ণ হ'য়ে শুনতে শুনতে বললুম, 'রজতের উপর তোর আনুগত্যের কথা আমরাও খুব ভালো ক'রে জানতুম সীতা।'

'কেন জানবে না—' সীতা চিরুণী পরিষ্কার করলো, আমি তো আমি ছিলুম না, গুরুর কাছে শিষ্যের মতো আমি আমাকে উৎসর্গ করেছিলুম রজতের কাছে। আর রজত এতো মূর্খ যে সেটাকে সে তার প্রাপ্য ব'লে ধ'রে নিলো। একবারও ভাবলো না সব স্ত্রীই তাদের স্বামীকে এরকম ভালোমন্দ নির্বিশেষে ভালোবাসার ক্ষমতা রাখে না।'

'ঐখানেই তুই ভুল করেছিলি।'

'ঠিক বলেছো। আসলে গোড়া থেকেই ওকে আমার শাসন করা উচিত ছিলো।'

আমি হাসলাম, 'কেন, শাসনই বা করবি কেন ? ও কি শিশু ?'

'কিন্তু ও স্বামী।'

'স্বামীকে বুঝি শাসন করতে হয় ?'

'নিশ্চয়ই।'

'কেন ?'

'স্বামী শব্দটার অর্থ জানো তো ? না কি তাও জানো না ?' সীতা উত্তেজিত হয়েছে বুঝলাম।

কৌতুক ক'রে বললাম, 'তোর ব্যাখ্যাটা শুনি।'

'কোনো ব্যাখ্যা নেই, সহজ কথা এই যে এই শব্দটিই যতো অনিষ্টের মূল। একজন মানুষ যদি জন্মের পর থেকেই জানতে পারে যে সে স্বামী তা হ'লে অন্য সব কোমল বৃত্তিগুলো ছাপিয়ে দম্ভটাই বড়ো হ'য়ে ওঠে। স্বামীর অর্থ তো শুধু একটি গণ্ডিবদ্ধ জলাশয় নয়, তার চেয়ে অনেক অনেক অনেক বড়ো। স্বামী মানে প্রভু ঈশ্বর ভর্তা কর্তা সব। অবচেতন থেকে এই বোধই সকল পুরুষকে সমান মূঢ় এবং দাম্ভিক করে তোলে। মানুষ তো তাদের কাছে মানুষ নয়, সে পুরুষ কিনা সেটাই বিবেচ্য ; দ্যাখো না মেয়েদের সম্পর্কে কী রকম অবহেলা করে কথা বলে ওরা। ঝগড়া তর্ক হলেই রজত আমাকে বলত যাও, যাও, মেয়ে হয়ে জন্মেছ, হাতা খুন্তি নাড়োগে, আমার উপর ওস্তাদি করতে এসো না। কেবল আমাকে নাকি ? ওর মাকে বলতো না ? দিদিদের বলতো না ?'

'সেটা রজত পুরুষ বলেই বলতো ধ'রে নিচ্ছিস কেন। ওর স্বভাবই হয় তো ওরকম।'

'স্বভাব! স্বভাব তো একেবারে সোনা বাঁধানো, জেদ, মতলব, নিজের ইচ্ছের উপর অতিরিক্ত আসক্তি—কী না ? ওর মা ওকে আদর দিয়ে দিয়ে এক ধরনের বিষ খাইয়েছেন, যে বিষ ও কোনো-দিনই আর ঝেড়ে ফেলতে পারেনি জীবন থেকে। আবার

গলাধঃকরণও করতে পারেনি।'

'সীতা, আমার মনে হয়—'

'আমি যে ওর ছায়া ছিলুম সেটা যে আমার ব্যক্তিত্বের অভাবে তা নয়, ভালোবাসার গৌরবে সেটা বোঝার শক্তি ওর ছিলো না কি? ছায়া আমি আমার পিতৃগৃহেও ছিলুম, তার মধ্যেই আমার সব প্রতিবাদ লুকোনো ছিলো। আমি যে কিছু চাইতুম না নিতুম না, আবদার অভিমান কান্নাকাটি কিছুই না ক'রে বড়ো হয়েছিলুম, সেটাই ছিলো আমার সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র। অবশ্য সেখানেও সেই অস্ত্রের কোনো দাম ছিলো না, সরবে যেদিন রুখে দাঁড়ালুম তাতেই কাজ হ'লো, কিন্তু কী করবো, ঐ আমার ধরণ! রজতের সব কথা মান্য করতে আমার ভালো লাগতো, রজত যা বলতো যা করতো সব আমার এতো প্রিয় হ'য়ে উঠতো যে আমি আমাকে হারিয়ে যেতে দিতুম তার মধ্যে। তা ছাড়া রজতকে আমি শ্রদ্ধাও করতুম খুব, সত্যিই তার মধ্যে কোনো ছোটো কিছু আমি দেখিনি কখনো। তার মতামত প্রায় আদর্শবাদীর পর্যায়ে পড়তো, তার ব্যক্তিত্ব রীতিমতো অনুকরণযোগ্য ছিলো—'

'তবে, তবে এখন তোদের কী হ'লো সীতা!' এটা আমার স্বতোৎসারিত ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

'কী হ'লো?' সীতা খাটে পা ঝুলিয়ে বসেছিলো, পা তুলে নিয়ে, আধশোয়া হ'তে হ'তে আমার চেয়েও ব্যাকুল জিজ্ঞাসায় ব'লে উঠলো 'কী হ'লো সবিতাদি? কেন হ'লো? কেন ও এমন বিগড়ে গেলো?'

'তারপর, সবিতাদি—'

'বল।'

'এরকম কখনো শুনেছ যে বাপ তার সন্তানকে হিংসে করে?'

'কেন, রজত করতো নাকি ?'

'হ্যাঁ।'

'তোদের তো এই একই ছেলে ?'

'ছেলে ? ছেলে কোথায় ?' এখানে গলার স্বর ডুবে গেলো সীতার।

'বললি যে দেরাদুনে।'

'দেরাদুনে !' সে কেঁদে উঠলো, 'পৃথিবীর কোথাও সে আর নেই সবিতাদি।'

'সে কী !'

'সে মারা যায় ছ'বছর বয়সে।'

'সে নেই ?'

'না।'

'তা হ'লে যে তুই বললি—'

'আমি প্ল্যানচেটে ওকে ডেকে এনেছিলাম, ও বলেছিলো, মাগো, আমি তোমার কাছে কাছেই থাকি। আমার বোর্ডিং ভালো লাগে না।'

'বোর্ডিংয়ে ছিলো ?'

'হ্যাঁ।'

'বোর্ডিংয়ে পাঠিয়েছিলি কেন ? একটা তো ছেলে, তা-ও কতো আরাধনা ক'রে। ইশ্ শ্ ! কোন্ বোর্ডিংয়ে ছিলো ?'

'দেরাদুনে।'

'দেরাদুনে ? অত দূরে ? কেন ?'

'রজতেরই কোনো এক বন্ধু তাঁর ছেলেকে সেখানে রেখেছিলেন, বললেন খুব ভালো জায়গা, স্বাস্থ্যের দিক থেকেও ভালো পড়াশুনোর দিক থেকেও ভালো। তারপর হঠাৎ একজন ফাদারের সঙ্গে আলাপ হ'য়ে গেলো, শুনলাম তিনি তাঁর সমস্ত অল্পবয়সটাই সেখানে

কাটিয়েছেন, বর্তমানে কলকাতা এসেছেন বটে তবে মন টিকছে না। শীগ্‌গিরই আবার ফিরে যাবেন। তিনিই বললেন, সব দিক থেকে ছেলেমেয়েদের অমন একটা চমৎকার শিক্ষালয় আর নেই? নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দাও, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি তোমার ছেলেকে যাতে ওরা স্পেশাল কেয়ার নেয়। আর আমি যখন ফিরে যাবো, তখন আমিই দেখবো, আমিই ওর গড ফাদার হবো। ভেবে চিন্তে দিয়ে দিলুম।'

'রজত কিছু বললো না?'

'কী আবার বলবে? ওর জন্যই তো দিলুম।'

'ওর জন্য কেন?'

'কী বলবো! কী আর বলার আছে! রজতের কোনো মনুষ্যত্ব ছিলো না তখন।' কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সীতা বললো, 'মদ, মদ আর মদ। মদের নেশায় ও তখন উন্মাদ। বলতে পারো সে-ও এক ধরণের সন্ন্যাস। একেবারে কা তব কান্তা কস্তে পুত্র। স্ত্রী-পুত্র তো তখন সত্যিই বাধা। সকাল থেকে শুরু করতো, ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত কি থামতো নাকি?'

'চাকরী করতো না?'

'আমি তো সেটা ভেবেই অবাক হই। কী ভাবে যে ওর চাকরি রক্ষা হ'তো তা আমারও বোধগম্য হ'তো না। দিব্যি চান-টান ক'রে খেয়ে স্যুট বুট চাপিয়ে চ'লে যেতো আপিসে, কখনো ঠিক সময়ে ফিরে আসতো, কখনো মধ্য রাত্রে।'

আমি দীর্ঘশ্বাস নিলাম।

.সীতা বললো, 'মানুষটাকে একেবারে অপদার্থ ক'রে দিয়েছিলো ঐ এক নেশা। আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি সবিতাদি। রাগ অভিমান, কান্নাকাটি, হাতে পায়ে ধরা, কাকস্য পরিবেদনা। মাঝে-মাঝে হঠাৎ বিবেকের যন্ত্রণাও যে না হ'তো তা নয়, তবে সেটা ক্ষণিক। তা ছাড়া

সেই যন্ত্রণা দূর করতেও তো ঐ মদ। শেষ পর্যন্ত অন্য কোনো আকর্ষণ আর কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না।'

'ছেলের উপরেও না?'

'নিজের সন্তান, কিছু টান নিশ্চয়ই ছিলো কিন্তু তার দিকে তাকাবার সময় কোথায় ওর? নাম রেখেছিলাম উপমন্যু। অপু বলে ডাকতাম।'

'বিয়ের কতো বছর বাদে জন্মেছিলো?'

'তাই নিয়েই কি কম অশান্তি?' সীতা চোখ নামালো, 'রজত সন্তান চায় না, আমি চাই। যখন তিন বছর কেটে গেলো তখন আমি বদ্ধপরিকর হলুম। বললাম, সন্তান না হবার জন্য আমি কোনো নিয়ম মানবো না। আমি যে বন্ধ্যা নই সেটাও তো প্রমাণ করতে হবে আমাকে?'

রজত বললো, না, ওসব বাচ্চাকাচ্চার ঝামেলা আমি ভালোবাসি না।

আমি বললাম, তুমি না বাসতে পারো আমি যখন চাইছি তখন তারও একটা সমাধান তোমাকে দিতে হবে। কেন, আমার ইচ্ছের কি কোনো মূল্য নেই? কেবল তোমার ইচ্ছেই ইচ্ছে? বলে খরচ পোষাবো কী ক'রে? শোনো কথা। আঠেরোশো টাকা মাইনে পায়, তার খরচের চিন্তা? চিন্তা হবে না তো কী বলো? মাসে হাজার টাকা তো নেশার মাশুল গুণতেই বেরিয়ে যায়। কিন্তু আমি আমার জেদ ছাড়লাম না। আর সেই জেদ দেখে একটু হকচকিয়ে গেলো রজত। ও জানতো না ওর যুক্তিতর্ক বুদ্ধির উর্দ্ধেও আর কারো কোনো আলাদা মত থাকতে পারে। আমার তো নয়ই। সেই প্রথম ও অনুভব করলো ওর সব বাসনাতেই অঞ্জলি হ'য়ে থাকার নেশা আমার কেটেছে। কিন্তু যখন ছেলে জন্মালো, তখন অবিশ্যি খুশিই হ'লো খুব। স্নেহের সাগরও যে উথ্‌লে না উঠতো তা-ও নয়, তবে

সেটা ওকে এতোখানি অভিভূত করলো না যার বিনিময়ে নিজের নেশা থেকে কিছুটা স'রে আসতে পারে। আমরা বলি মদই মানুষকে খায়, মানুষ মদকে খায় না। কথাটার কোনো সত্যতা নেই। আসল কথা হচ্ছে যার প্রবৃত্তি যেমন। রজতের চরিত্রে এমন কোনো উদারতাই ছিলো না যাতে অন্যের জন্য কিছু করতে পারে। বাচ্চাটা যে কী সুন্দর হয়েছিলো, কী স্বাস্থ্য কী রং—কতোকাল বাদে আমি যেন একটা দুঃস্বপ্নের জগদ্দল পাথর সরিয়ে ফেলতে পেরেছিলুম হৃদয় থেকে। ছেলের নেশায় তার মাকেও অনেক আদরের চোখে দেখতে শুরু করেছিলো রজত, আমার সেই রজত, যার জন্যে আমি ত্রিভুবন তোলপাড় ক'রে ফেলতে পারতুম।'

'তারপর?'

'তারপর মিটে গেলো পুত্রস্নেহ। বদলে যা হ'লো, একেবারে জঘন্য।'

'মানে?'

'হিংসে।'

'কাকে হিংসে?'

'নিজের সন্তানকে, আবার কাকে।'

'কী বলছিস?'

'আমার মন্দ ভাগ্যের সূত্রপাত তো আমার জন্ম থেকেই, কী আর আমার বেশী প্রাপ্য থাকতে পারে সবিতাদি। রজতের অভিযোগ হ'লো মেয়েরা সন্তানবতী হবার পরে আর তাদের স্বামীদের ততো ভালোবাসে না, সেবা করে না, এ্যারোগেণ্ট হ'য়ে যায়, অবাধ্য হ'য়ে যায়, ঝগড়াটে হয় ইত্যাদি—এই সব অভিযোগের কোনো জবাব ছিলো না আমার। অতিষ্ঠ হ'লে শুধু মাঝে-মাঝে বলতুম, কী ছেলেমানুষী করো। প্রথমে বুঝিনি, পরে দেখেছি এ কথা বললে ও আরো চ'ড়ে ওঠে। অকারণে একে-ওকে বকাবকি

ক'রে, কাজের লোকেদের অতিষ্ঠ ক'রে তোলে।'

'কী আশ্চর্য।'

'আরো আশ্চর্য এই যে, শেষ পর্যন্ত ও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে শুরু করলো যে সত্যিই আমি ছেলে হবার পর থেকে ওকে আর ভালোবাসি না, মান্য করি না। ফলে কী যে অশান্তি আরম্ভ হ'লো তার কোনো হিশেব নেই। মারধোর চিৎকার চ্যাঁচামেচি—'

'বলিস কী?'

'তখনই ঐ ফাদারের সঙ্গে আলাপ, সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেকে পাঠিয়ে দিলুম, মনে-মনে ভাবলুম সুখের চেয়ে স্বোয়াস্তি ভালো। হা আমার কপাল—' সীতা কপালে করাঘাত করলো, 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। তখন আবার আর এক উপসর্গ হ'লো, আমি নাকি সারাবেলা ছেলের ভাবনা ভাবতে-ভাবতে ঘরের সব কাজে অবহেলা করি। আসল কথা একটা অপরাধবোধ থেকেই যতো সব আজে বাজে উদভুট্টী কথা ব'লে আমাকে যন্ত্রণা দিতো। ও তো জানতো ওর এই অভ্যাস আমার পক্ষে কী ভীষণ ঘৃণা এবং ক্রোধের উদ্রেক করে, তাই একটা আক্রোশে জ্ব'লে-জ্ব'লে যা তা করতো। আমি মনে-মনে বলতাম ও একটা কঠিন আঘাত পাক, যার ধাক্কায় এই রোগ ওর সেরে যাবে। বোধহয় আমার সেই একান্ত ইচ্ছে পূরণ করতেই ম'রে গেলো ছেলেটা।'

॥ নয় ॥

বলতে বলতে প্রায় শব্দ ক'রে কেঁদে উঠেছিলো সীতা। আমি স্তম্ভিত বেদনায় অপলকে তাকিয়ে থাকলাম তার দিকে। সে একবার চুলের ভিতর মুঠো ক'রে ধরছিলো, একবার বিছানার চাদর খামচাচ্ছিলো তবু শোক সামলাতে পারছিলো না। উঠলো, হাঁটলো, জল খেলো, বাথরুমে গেলো, ফিরে এলো তবু তার হেঁচকি উঠছিলো থেকে থেকে।

আমি বললাম, 'সীতা, আয় আমার কাছে আয়, শুয়ে পড়ি এবার।'

সে বললো, 'মারা গিয়েছিলো বোর্ডিংয়ে, শেষ দেখাও দেখতে পারিনি আমি। পরে শুনেছিলাম, ভীষণ মন খারাপ ক'রে থাকতো, রাত্তিরে কাঁদতো, বই খাতা ভর্তি শুধু লিখে রাখতো মা মা মা।'

'আহা—'

'আমি পাথর হ'য়ে গিয়েছিলুম, বোধহয় মাথারও ঠিক ছিলো না। রজতও সত্যিই একটা মস্ত আঘাতে সব অন্যায় পিছনে ফেলে স্বপ্নোত্থিতের মতো জেগে উঠে তাকালো সংসারের দিকে। অপু কই? অপু নেই। এই বোধ তাকে সাময়িক ভাবে শোকের পাথারে ভাসিয়ে দিলো। আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়েছে, দুই পায়ের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে ক্ষমা চেয়েছে, তারপর যাতে আর একটি শিশু এসে এই ভয়ঙ্কর কষ্টে প্রলেপ হ'য়ে ওঠে চেষ্টা করেছে তার জন্যে।

কিন্তু আর সন্তান এলো না সেই অভিশপ্ত ঘরে। দেখতে-দেখতে রজত আবার দুর্ধর্ষ হ'য়ে উঠে একেবারে অধঃপাতের চরমে গিয়ে

পৌঁছলো। সেই সঙ্গে আমার উপরও একটা অদ্ভুত আক্রোশ হ'লো তার। এই মনস্তত্ত্বের কোনো অর্থ আমার জানা নেই। মস্ত চাকরি করে ব্রিটিশ ফার্মে, আজ এখানে পার্টি, কাল সেখানে, পরশু বাড়িতে আর সবই তো মদ, যাকে বলে একেবারে উত্তাল অবস্থা।

একসঙ্গে থাকা তখন যে কী কঠিন হ'য়ে উঠেছিলো বলবার নয়। কিন্তু যাবো কোথায়? খাবো কী? মেয়েদের একটা মস্ত জোর তার পিত্রালয়, আমার তো সে জোরটুকুও নেই। বাবা থাকতেও ছিলো না, আর এখন অসহায় মা-ও যে দুঃখভাগিনী হবেন এমন তার সাধ্য নেই। মাধব আর মাধবের বৌ তাঁকে দায়ে আনে কুড়োলে কাটে। বাবা তো মাকে কিছু দিয়ে যান নি, সব মাধব। এমন কি মার গয়নাগুলোও মাধবের। সেটা অবশ্য মায়ের নিজেরি দান। ছেলে তো তাদের কাছে ঈশ্বর, তাকেই তো সব নিবেদন করা উচিত। করেছেন। দোষ দেবেন কাকে।

বি. এ. পাস করেছি, ভালো নম্বর ছিলো, যেখানে-সেখানে যে-কোনো চাকরির জন্য আবেদন পত্র পাঠিয়ে-পাঠিয়ে হয়রান হ'য়ে গেলাম। কী ডিপ্রেশন সেই সময়টায়। চাকরি পাওয়া আকাশের চাঁদ ধরার চেয়েও কঠিন হেঁটে-হেঁটে বা কতো খুঁজি। কোথাও কোনো আশা নেই আলো নেই। সেই রাত গেলে ভীষণ সকাল, সকাল গেলে ভীষণ দুপুর, আর দুপুর গেলে আবার সেই ভীষণ রাত। এই ভীষণতার সঙ্গে থাকতে-থাকতেই একদিন পথে বেরিয়ে পড়েছিলুম আত্মহত্যার কথা ভেবে।'

'আত্মহত্যা?'

'আর আমার কী উপায় ছিলো বলো?'

'সীতা—'

'এ ইচ্ছে আমার শুধু সেদিনই নয়, আরো অনেকবার হয়েছে। পরিনি সবিতাদি পারিনি। জীবনের মমতায় নয়, ভেবে পাইনি

কেমন করে মৃত্যুকে ডেকে আনবো। যে যে উপায় আমার শোনা ছিলো ছেলেবেলা থেকে, যেমন আফিং খাওয়া, ফাঁসি দেওয়া, কোনোটাই আমার কাছে সহজ মনে হয়নি। রজত ধ্যান রজত জ্ঞান ক'রে ক'রে আমি সংসারে একটা ছায়ার মতো হ'য়ে গিয়েছিলাম। কোথায় আফিং পাওয়া যায়, কেমন করে সংগ্রহ করতে হয় জানিনি, কেমন ক'রে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হয় তা-ও আমার জানা ছিলো না। কাজেই ব'সে-ব'সে ভাবাই সার। নিজের অপদার্থতার কথা চিন্তা ক'রে এখন আশ্চর্য হয়ে যাই।'

'সীতা তুই ক্লান্ত, অনেক রাত হয়েছে, এবার শুয়ে পড়।'

'ওর ভাত খেতে ঘেন্নায় ম'রে গেছি আমি। মনে হয়েছে না-ই বা পেলাম কোনো চাকরি, ভিক্ষে ক'রে খাবো, পথের আশ্রয়ে থাকবো। যাকে বলে 'হাউস ওয়াইফ' আমি ছিলাম আক্ষরিক অর্থেই তাই। বাইরের জীবন ছিলো ধোঁয়াটে, আমি কেমন ক'রে পথের ভিক্ষুক হবো। সুতরাং রজতের দেওয়া সব অপমান অসম্মান ঢোঁক গিলে হজম করতাম। রজত, সেই রজত, ভাবতে পারবে না কী এক ভয়ঙ্কর শয়তানে পরিণত হ'য়ে গিয়েছিলো।'

'সীতা আমি বলছিলাম কি—' এই কাহিনী আর আমি শুনতে পারছিলাম না, আমি ওকে থামিয়ে দিতে চেষ্টা করছিলাম। ও আমার কথা শুনছিলো না, প্রলাপের মতো ব'লে যাচ্ছিলো সব।

'শেষ পর্যন্ত ভগবান দয়া করলেন, সত্যি একটা চাকরি পেলাম।' জানালা দিয় বাইরে তাকালো সীতা, ঘরের দেওয়ালে তাকালো, দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, 'উঁচু দামের আয়ার কাজ।'

.'আয়া?'

'বিজ্ঞাপন দেখেই গিয়েছিলাম। এক অবাঙালী অসুস্থ মহিলা ইনটারভিউ নিলেন। তাকিয়ে প্রথমেই বললেন আপনি এ কাজ

করবেন?' আমি বললাম, সেজন্যই এসেছি। মহিলা চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'স্বামী কী করেন?'

কপালে সিঁদুর ছিলো না, হাতে লোহা ছিলো না, যেটা ছিলো সিঁথিতে অনেক দিনের লেগে থাকা এক বিন্দু দাগ। কেন যে সেটা সাবান ঘষে তুলে ফেলিনি কে জানে। সহজ ভাবেই বললাম, 'স্বামীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই।'

মুখের ভাবে বোঝা গেলো মহিলা দুঃখিত হলেন। চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'আপনি তো বি. এ. পাস?'

'হ্যাঁ।'

'এর চেয়ে ভালো কাজ কি—'

আমি অসহিষ্ণু হ'য়ে বললাম, 'না।'

মহিলা বললেন, 'এখানে অবশ্য কোনো অসুবিধে হবে না। আমি রক্তাল্পতায় ভুগছি। কিছুই করতে পারি না। দু'টি ছোটো-ছোটো বাচ্চার রক্ষণাবেক্ষণের ভার আপনার উপরই ছেড়ে দিতে চাই, পারবেন?'

'পারবো।'

'আপনার নিজের ছেলেমেয়ে আছে?'

জবাব দিতে চোয়াল ব্যথা করলো তবু স্পষ্ট ক'রেই বললাম, 'একজন ছিলো, এখন তার নিবাস স্বর্গে, ভগবানের কাছে।'

'ওহ্?'

'আমি শিশুদের ভালোবাসি।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আপনি যেদিন খুশি সেদিন থেকেই কাজে যোগ দিন।'

'কতোক্ষণ থাকতে হবে?'

'সকাল সাড়ে ন'টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা।'

'বেশ। আমি কাল থেকে আসবো।'

'তাই আসুন।'

মাইনে ভালো ছিলো, দুপুরের খাওয়া ছিলো, বিকেলের চা ছিলো, লেগে গেলাম কাজে। তাদের লেখানো পড়ানো নাওয়ানো খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, নিয়ে বেড়ানো, কাঁদলে শান্ত করা, মর্জি পালন সব দায়িত্বই আমার। ভদ্রতা-সভ্যতা শেখানোও আমার কাজ। বিছানা পেতে শোওয়াতে হবে, কাঁটা ধরিয়ে সাহেব বানাতে হবে—অর্থাৎ সারাদিন সমস্ত সময় তাদের নিয়েই ব্যাপৃত থাকতে হবে। তা মন্দ কী? দু'টি নিষ্পাপ শিশু আমার ক্লেদাক্ত জীবনের অনেক গ্লানি ভুলিয়ে রাখতো।

রজত নিয়মিতভাবে সাড়ে আটটায় ব্রেকফাস্ট ক'রে বেরিয়ে যায়, আমার সঙ্গে বাক্যালাপ প্রায় বন্ধই থাকে বেশীর ভাগ দিন। ও কথা বলতে চাইলেও আমি বলি না। রজত বেরিয়ে গেলেই স্নান-টান ক'রে প্রস্তুত হ'য়ে আমিও বেরিয়ে পড়ি। রজত আপিসের পরে ক্লাবে যায়, মদ-টদ খেয়ে ফিরতে ফিরতে একেক দিন একেক রকম রাত করে, আমি তার অনেক আগেই ফিরে আসি। ও জানতোই না আজকাল আর আমি ওর ভাত খাই না। তবু আমরা স্বামী-স্ত্রী, এক বাড়িতে থাকি, বড়ো বড়ো পার্টি হ'লে একসঙ্গে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাই। নিজের দৈন্য কে আর অন্যের চোখে ধরা দিতে চায়?

বুঝলে সবিতাদি রজত জানুক না জানুক আমি যে আমার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে পেরেছি, তাতে আমার মনে কেমন একটা জোর এসেছিলো। আমার জেদ বাদ প্রতিশোধ সবই তো চিরকাল এমনি গোপনে। এক ধরণের সোয়াস্তি হ'লো। কাজ করতে-করতে বুঝতে পারলাম, মহিলাটি এমনিতে মন্দ নয়, মায়াদয়া আছে, কোনো কার্পণ্যও নেই, বেশ মিশুকও, আমার সঙ্গে ব্যবহারও খুব ভালো, তবে সামান্য খিটখিটে এবং প্রধান দোষ ভীষণ সন্দেহ-

প্রবণ। পারলে স্বামীকে সে অবিরাম পাহারা দিয়ে বেড়ায়। কোনো কারণেই যেন কোনো মেয়ের সঙ্গে তার দেখা না হ'য়ে যায় এই তার আপ্রাণ চেষ্টা। ঐ জন্যে কাজটা সকাল থেকে না হ'য়ে সাড়ে ন'টা থেকে। ভদ্রলোক ততোক্ষণে আপিসে চ'লে যান, আবার ফেরেন আটটায় সেজন্যই সাড়ে সাতটায় বিদায়। মজা মন্দ নয়। সেবক-সেবিকা সেখানে আরো অনেকে ছিলো। ভদ্রমহিলার নিজের জন্যও আলাদা নার্স ছিলো। তবু সবসময়ে গল্প করার জন্য আমাকেই ডাকতেন, আমার জন্যই উৎসুক হ'য়ে অপেক্ষা করতেন, চাকরি করি ব'লে সমকক্ষ ভাবতে কোনো দ্বিধা করতেন না। তার ফলে আমার মনে কোনো অবমাননার ভাব আসতে পারেনি। কিন্তু যেই সন্ধ্যে হ'তো, পাছে স্বামী এসে পড়েন, আমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায় একেবারে পাগলের মতো হ'য়ে পড়তেন বিদায় দেবার জন্য। বাচ্চা দু'টি সহজে ছাড়তে চাইতো না, বকাবকি করতেন সেজন্য। আমার হাসিও পেতো কষ্টও হ'তো। ভদ্রলোকটিকে দেখবার জন্য কৌতূহলও বোধ করতাম একটু।

বাচ্চা দু'টি ভারি লক্ষ্মী ছিলো। কক্ষণো অবাধ্যতা করতো না, অমান্য করতো না, লেখাপড়ায় ফাঁকি দিতো না, খুব ভালোও বাসতো আমাকে। কখনো দুষ্টুমি করলে আমি যদি বলতাম, 'ঠিক আছে, কাল থেকে আর আসবো না', অমনি দৌড়ে এসে গলা জড়িয়ে ধ'রে প্রায় কান্না। আমার ব্যর্থ ব্যাকুল মাতৃহৃদয় উথাল-পাথাল করতো। আমি বুকের মধ্যে চেপে ধরতাম ওদের, জ্বলন্ত হৃদয় ওদের কচি শরীরের প্রলেপে ঠাণ্ডা করতে চাইতাম। মনে-মনে বলতাম এদের সকলের মধ্যেই তো আমার অপু বেঁচে আছে। সম্ভবত কিছুটা শান্তি ওরা আমাকে দিয়েও থাকবে।

ওদের জীবনও তো একধরণের মাতৃহীনতায় বুভুক্ষু।

ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, রক্তাল্পতার দোষ তাদের পারিবারিক

অসুখ। একটি সন্তান হবার পরেই সেজন্য ডাক্তার অপারেশন ক'রে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর স্বামীও তাতে রাজী ছিলেন। তিনিই দেননি। ভারি একটি মেয়ের শখ ছিলো তাঁ ভেবেছিলেন আর একটি হোক তখন দেখা যাবে। তা হ'লো কিন্তু আবার ছেলে হ'লো। আর সেই যে বিছানা নিলেন এখনো উঠতে পারলেন না। মায়ের আদর কাকে বলে ছোটোটি তো জানলোই না কোনোদিন, বড়োটিই বা কতোটুকু পেলো। বড়োটি হবার পরেই তো শরীরের অবস্থা কাহিল। যা করে কাজের লোকেরা। তারাই খাওয়ায় তারাই নাওয়ায় তারাই ঘুম পাড়ায়—ছেলেরা কিছুতেই তাদের বশ হ'তে চায় না। দেখলেই কাঁদে। কেন কে জানে। নিশ্চয়ই গোপনে-গোপনে নির্মম ব্যবহার করে।

ছোটোটি তিন বছরের বড়োটির বয়েস পাঁচ। আমাকে পেয়ে ওদের মায়ের অভাব পূরণ হয়েছিলো।

চাকরি পাবার আগে ভেবেছিলাম, বেঁচে থাকার মতো একটু কুটো ধরতে পারলেও সর্বপ্রথম রজতের সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করবো। অন্তত তার বাড়িতে আর কিছুতেই নয়। কাজ পাবার পরে কিন্তু দেখলাম ভাবা এক জিনিস করা অন্য। আসলে অন্য কারো আশ্রয় না পেলে রজতের আশ্রয় ত্যাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। একা একা যে কেমন ক'রে বাঁচতে হয় আমি যে তা জানি না। সত্যি বলতে কোনো মেয়েই কি জানে?'

॥ দশ ॥

সীতা চুপ করলো, একপলকে তাকিয়ে রইলো কোন্‌দিকে, বললো, 'না জানে না। এই রক্ষণশীল সমাজে তাদের জানবার কোনো পথই খোলা নেই। জীবনের শুরু থেকেই তারা আশ্রিত। পিতার আশ্রয়, স্বামীর আশ্রয়, শ্বশুর ভাসুরের আশ্রয়, ভাইয়ের আশ্রয়, জ্ঞাতি গোষ্ঠির আশ্রয়—অবস্থা ভেদে একজন না একজন পুরুষের আশ্রয় তাদের চাই-ই। হাজার লাথি-ঝাঁটা খেলেও একটি যুবতী মেয়ে একা হ'য়ে স্বাধীনভাবে কোথাও বাস করবে সেটা হ'তে দেবে না এই সমাজ। কুৎসায় কান পাতা যাবে না। করুণার দৃষ্টিতে তাকাবে, সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাবে, মধ্যযুগের মতো ঢিল ছুঁড়ে মেরে না ফেললেও অতিষ্ঠ ক'রে তোলবার মতো অনেক হাতিয়ারই আছে সমাজের।

আর লোকলজ্জা। সে তো এক সাংঘাতিক ব্যাধি আমাদের। সারাদিন ত্রাস এই বুঝি ঘরের খবর পরে জানলো। লোকের চোখে ধুলো দিয়ে ঐজন্যই আমরা সব সময় সুখী-সুখী ভাব দেখাই। ম'রে গেলেও বলতে পারবো না আমার স্বামী আমাকে অপমান করে, এ বাড়িতে আমি একটা কুকুর বেড়ালেরও অধম। ভাবটা করবো যেন আমিই সর্বেসর্বা, আমার কথাই কথা। উঃ। কী বিশ্রি। কী বিশ্রি। কী নরক। কী নরক।

তুমি তো জানো সবিতাদি, এই রোগের ডিপো হচ্ছি আমি। আমি কোনোরকমেই কোনো বিদ্রোহ করতে পারি না। এই বুঝি কে কী বললো সেই আতঙ্কেই সবসময় বিব্রত। আর ভীতুও তো কম

ছিলুম না। তাছাড়া কে জানে রজতের প্রতি তখনো আমার প্রথম জীবনের প্রথম ভালোবাসার কিছু হয়তো অবশিষ্ট ছিলো। ছেলেকে হারিয়েছি, তার বাপকে হারাবার বেদনায় টনটন করতো বুকের ভিতরটা। আত্মীয় পরিজন বা প্রতিবেশীর কাছে ভান করতুম আমরা ভালোই আছি। ভুলক্রমেও কখনো কারো কাছে রজতের নিন্দে করতুম না, অন্যে করলেও অসহ্য বোধ হ'তো।

সেজেগুজে পার্টিতে যেতে শিখেছিলুম খুব, সেই অবস্থায় আমাকে দেখলে কে বলবে আমি ভিতরে ভিতরে অবিশ্রান্ত মৃত্যুকে কামনা করি, রজতের ভাত খেতে ঘেন্নায় বমি করি, লোকের বাড়িতে আয়ার কাজ ক'রে গ্রাসাচ্ছাদন চালাই। সেই সময়ে সুন্দর একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলো রজত। খুব সুন্দর। কোম্পানী থেকে ভাড়া পেতো। আস্তো একতলা বাড়ি, ছোটো লন ছিলো, মালি বাগান করতো। ঐ বাড়িতেও রজত মাঝে-মাঝে ককটেল পার্টির আয়োজন করতো, কোথা থেকে যে সব নিজের মতোই মদ্যপ ধ'রে নিয়ে আসতো কে জানে। আকণ্ঠ মদ গিলে সবাই মাতাল। রজত তো বটেই। বাইরের কোনো পার্টি থেকে রজতকে নিয়ে বাড়ি ফেরা যে কী কঠিন কর্ম ছিলো সে শুধু আমিই জানি। ড্রাইভারের সাহায্যে টেনে হিঁচড়ে তোলা হ'তো গাড়িতে, নামানোও হ'তো তেমনি ভাবেই। তা-ও কি সহজে নামবে? কী চ্যাঁচামেচি, কী ধ্বস্তাধ্বস্তি। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যেতো।

ভেবে দ্যাখো, লজ্জা, রজতের জন্য লজ্জা। কিন্তু রজত আমার কে? সীতার বড়ো-বড়ো চোখের কোলে যেন ধিক্কার ঘনিয়ে আসে। বলে, 'একদিন এমনিই একটা পার্টি হচ্ছিলো বাড়িতে। অনেক নতুন মুখের স্ত্রী-পুরুষ এলো। রাত বাড়তে-বাড়তে প্রত্যেকেই মেতে উঠলো হুল্লোড়ে। আমার ধারণা এই সময়ে রজত কতোকগুলো অত্যন্ত নোংরা লোকের সংস্পর্শে এসেছিলো, এরা ঠিক আপিশের লোক বা পুরোনো

বন্ধু বান্ধব নয়। ভাটিখানার নবলব্ধ সঙ্গী। বড়োলোক, কিন্তু শিক্ষাদীক্ষাহীন, অসৎ চরিত্র। একজন চেঁচিয়ে উঠে বললো, 'আজকের এই পার্টি আমাদের অর্জি পার্টি হ'য়ে থাক।'

অর্জি পার্টি কাকে বলে আমি জানতাম না। একজন বুঝিয়ে দিলো স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলনের নামই অর্জি পার্টি। বুঝিয়ে দিয়েই সে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমি এক ধাক্কায় তাকে ফেলে দিয়ে চিৎকার ক'রে ডেকে উঠলাম, 'রজত।'

কোথায় রজত। স্তম্ভিত হ'য়ে তাকিয়ে দেখি সে-ও যেন কাকে জড়িয়ে ধ'রে বাগানের ঐ কোণে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ আলো নিবে গেলো। আমি ভয়ে ঐ অন্ধকারেই দৌড়ে হোঁচট খেতে-খেতে শোবার ঘরে চ'লে এলাম। থর থর ক'রে কাঁপছিলাম। আমার মনে হ'লো এই পার্টির উদ্যোক্তা রজত নয়, এই অপরিচিত লোক-গুলোর মধ্যেই একজন! মাসের অর্ধেক হ'তেই তো রজতের মদের খরচে টান ধরে, তখন সে মারমূর্তি। যে ক'রে হোক যে ভাবে হোক টাকা তার চাই-ই চাই। আজ তাকে এই নবলব্ধদের মধ্যে কে যে কী বুঝিয়ে কী কড়ারে মদের স্রোত নিয়ে এসে হাজির হয়েছে কে জানে!

অন্ধকারেই একটি ছায়া মূর্তি এগিয়ে আসছিলো আমার দিকে। আমি কিছু বোঝবার আগেই সে জাপটে ধ'রে আমাকে ফেলে দিলো বিছানার উপর। স্খলিত কণ্ঠে নিচুগলায় বললো, 'তোমাকে দেখা থেকেই আমি পাগল হ'য়ে আছি। কতো চক্রান্ত ক'রে তবে আজ আমার এই রাতের আয়োজন'। সে আমাকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হ'লো। আমি আসুরিক শক্তিতে তার সঙ্গে যুঝতে লাগলাম। পারি কী? মদ খেলে কী হবে, কী সবল লোকটা। না কি এই উদ্দেশ্যে আর সকলকে খাইয়ে মাতাল ক'রে নিজে ঠিক আছে?

'কী বলছিস তুই সীতা ?' আমার আতঙ্কিত আর্তস্বর দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হ'লো।

সীতা বললো, 'যা অক্ষরে অক্ষরে সত্য অথচ অবিশ্বাস্য ঠিক তাই।'

'রজত এই হ'য়ে গিয়েছিলো ?'

'তোমাকে কী বলবো মদ খেলে ওর কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকতো না। ঐরকম ভদ্র বুদ্ধিমান ছেলের মুখ দিয়ে অশ্লীল ভাষার খই ফুটতো। কিন্তু খুব আশ্চর্য কোনো কোনো দিন ও যখন খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়তো, এই মদের জন্যই অবশ্য, অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করতো, মদ ছুঁতে পারতো না, সেদিনই ওর মুখটা ঠিক আগের মতো নির্মল দেখাতো, আমার দিকে তেমনিই ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকাতো। অনেক ক্ষমা প্রার্থনাও যেন থাকতো তার মধ্যে।'

'হা ভগবান।'

'আমি সেই রাত্রেই বাড়ি ছেড়েছিলাম সবিতাদি। লোকটির সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে-করতে হাত বাড়িয়ে বেডসাইড টেবিলের উপরে দু'টি জিনিস পেয়ে গেলাম, একটি বেঁটে মোটা ভারি চীনে-মাটির টেবিল ল্যাম্প, আর একটি আমার ভ্যানিটি ব্যাগ। বেঁটে-মোটা ভারি চীনে মাটির আলোটা তুলে প্রচণ্ড জোরে আন্দাজেই একটা বাড়ি মারলাম, মনে হয় লোকটির মাথায় লেগেছিলো, সে আচমকা আঘাতে চমকে 'ওরে বাপরে গেলুম রে' ব'লে চিৎকার ক'রে উঠলো, তারপরেই তাকে ঠেলে ফেলে সেই ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে নিয়ে দৌড়ে চেনা পথ চিনে-চিনে দরজা খুলে সোজা একেবারে রাস্তায়।'

'ঈশ—'

'সেই বিভীষীকাময় দিনগুলোর কথা ভাবলে এখনো এতোদিন বাদেও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।' আমার দিকে তাকালো

সীতা, হেসে বললো, 'তুমি কাঁদছো কেন? তোমার এই বোনটির মেরুদণ্ড যে জেলিফীসের চেয়েও তলতলে তা কি জানো না। এই রকমই এক একটা ধাক্কা আমাকে আজ এখানে নিয়ে এসেছে। প্রথম রুখে দাঁড়িয়েছিলাম রজতকে বিয়ে করবার জন্যে বাবার উপর, তারপরে সন্তানের জন্মের জন্য স্বামীর উপর, শেষে চরম শাস্তি মাথায় নিয়ে নিজের উপর।

সুন্দর রাত ছিলো। কী ফুটফুটে জ্যোৎস্না, যেন ভেসে যাচ্ছিলো পৃথিবী। সুখ স্মৃতি তো বিশেষ কিছু নেই, তারি মধ্যে জলপাইগুড়ির শরৎকালটা মনে পড়লো। 'সেই লক্ষ্মীপূর্ণিমা। আহা। তোমার মনে নেই? আমাদের উঠোনটা কতোবড়ো ছিলো, লক্ষ্মীপুজোর দিন সারা উঠোন ভ'রে বড়দি আলপনা দিতো, মেজদি দিতো ঘরে-দুয়োরে, দু'জনেরই আঁকার হাত অপূর্ব ছিলো। মেয়ে হ'য়ে জন্মে কিছুরই তো কোনো মানে হ'লো না! শুধুই কষ্ট। আমাদের বোনগুলোর ভাগ্যও তেমনি।

'রাত তখন কতো?'

'কখন?' একটু বোধহয় অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়েছিলো, পরমুহূর্তেই প্রশ্নটা অনুধাবন ক'রে বললো, 'একটা পঁয়তাল্লিশ। হাতে ঘড়ি ছিলো বেরিয়েই চাঁদের আলোয় দেখেছিলাম। আজ কতো সহজে বলছি আর সেদিন?'

'সীতা, যদি তোর নিজের মুখে এসব আমি না শুনতাম, কখনো কি বিশ্বাস করতাম?'

'ভেবে ছাখো সেই রাত দেড়টা দুটোর নির্জন নিরালা পথে একা আমি, সেই জলপাইগুড়ির সীতা। কী যে আমার মনে হয়েছিলো বা হচ্ছিলো তা জানি না। একটা গভীর যন্ত্রণায় কেবল মুচড়ে মুচড়ে উঠছিলো ভেতরটা। কোনদিকে যাচ্ছি জানি না, কোথায় যাচ্ছি

জানি না, শুধু জানি যাচ্ছি, পালাচ্ছি। একমাত্র রজতের ঠিকানা ছাড়া আর কোনো ঠিকানা তো আমার সত্যিই জানা ছিলো না।'

সীতার চোখে আবার জল এলো, 'প্রায় অচৈতন্যের মতোই অনেক দূর চ'লে এসেছিলাম। হঠাৎ মনে হ'লো দূর থেকে কে যেন আমাকে লক্ষ্য ক'রে হেঁটে আসছে।'

'রজত, না ?'

বাঁহাতে চোখের জল মুছে হাসলো সীতা, 'হরি হরি, আশা তোমার কম নয় দেখছি। রজত আসবে কী ? ও কি আমার খোঁজে ব্যস্ত ? হয়তো তখন যেখানে সেখানে গড়িয়ে প'ড়ে আছে, গ্যাঁজলা উঠছে মুখ দিয়ে, জ্ঞান গম্যি থাকে নাকি সেই সময়ে ?

'তবে ? তবে কে ? গুণ্ডা চোর—' আমি ভয়ার্ত চোখে তাকালাম।

আমার ভয় দেখে সীতা বললো, 'না, একটা ভিখিরি।'

'ও, ভিখিরি—' বুকের থেকে যেন বোঝা নামলো।

সীতা বললো, 'ভিখিরি ভেবে নিরুদ্বেগ হবার কোনো কারণ নেই। সে আমার কাছে কোনো পয়সা চাইতে আসছিলো না।'

'তবে ?'

দুর্ধর্ষ জোয়ান একটা লোক, চাঁদের আলোয় ব'সে-ব'সে সারাদিনের সব রোজগার গোপন পুটুলি থেকে বার ক'রে অন্যদের ঘুমোবার সুযোগে চুপে-চুপে গুণে দেখছিলো আর ইচ্ছেমতো ঘা ক'রে রাখা পায়ের রক্ত পুঁজ মাখা পটি খুলছিলো, হঠাৎ একা রাস্তায় একা একজন মেয়ে দেখে সব ভুলে তার কুপ্রবৃত্তি জেগে উঠলো। আমি দিকবিদিক হারা হ'য়ে দৌড় লাগালাম। সেও দৌড়োলো। দৌড়োচ্ছিলো লেংচে লেংচে, ঐ ল্যাংচানিতেই রক্ষা পেলাম। নইলে প্রায় ধ'রে ফেলেছিলো আর কী সব কুৎসিৎ কথা উচ্চারণ করছিলো বিড়বিড় ক'রে। উপায় থাকলে বাড়ির দিকেই ফিরে যেতাম নিশ্চয়। উপায় ছিলো না, লোকটা তো পিছনে। আমি আর কী ক'রে

পিছিয়ে যাই? সামনেই এগুতে হচ্ছিলো। অন্ধকার রাত হ'লে কোথাও গা ঢাকা দেওয়া হয়তো সম্ভব হ'তো, কিন্তু ঠিক এই আজকের মতোই জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাতে, যেখানে একটা সূঁচ পড়লেও খুঁজে বার করা যায় সেখানে আমি কোথায় লুকোবো? একটা গলি দেখে ঢুকে পড়লাম সেখানে। কিন্তু ঢুকলে কী হবে, ও তো দেখতেই পেলো। তবে এই গলি দিয়ে আমি কোথায় পালাবো? কোথায় আমার নিস্তার এই লোকটার হাত থেকে? দু' হাত বুকের মধ্যে জড়ো ক'রে আমি একমনে ভগবানকে ডাকলাম, তিনি শুনতে পেলেন, তিনি আমাকে বাঁচালেন। আমাকে রক্ষা করলেন। দয়া করলেন। বিহ্বল চোখে তাকিয়ে দেখি আমি একটা বিশাল পোড়ো বাড়ির ভাঙা ফটকের মধ্যে ঢুকে গিয়েছি।'

॥ এগারো ॥

চুপ ক'রে থেকে সীতা দম নিচ্ছিলো, এতোক্ষণ ধরে এতো কথা ব'লে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো সে। এতোকাল বাদে এতো কথা নিঃশেষে উজাড় করতে করতে ভুলে যাওয়া যন্ত্রণা নতুন ক'রে বেদনা জাগাচ্ছিলো তার মনে। সে জোরে-জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলো, আমি রুদ্ধশ্বাসে শুনছিলাম এবং বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে তার দুঃখের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে সমান কষ্টে বিদ্ধ হচ্ছিলাম।

সে জল খেলো। হাত কাঁপছিলো, খানিকটা ছলকে পড়লো মুখে বুকে। মুছে নিয়ে বললো, 'খুব আশ্চর্য, সারাজীবনে আর আমার তোমার মতো কোনো বন্ধু হ'লো না, যাকে সব ব'লে হৃদয়ের ভার অন্তত কিছুটা লাঘব করতে পারি। এতোদিন বাদে আবার তুমি, সেই আমার ছেলেবেলাকার একমাত্র ভালবাসার জন।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমি তো তোর কোনো ভালো করতে পারিনি। অথচ চেয়েছিলাম।'

'এটা তুমি কী বলছো? চিরস্থায়ী হ'লো না বলেই কি সব মিথ্যে? না। না সবিতাদি তুমি আমার দুঃখী জীবনকে রংয়ে রংয়ে ভ'রে দিয়েছিলে। রজতকে পাবার সুখ তো আমার অলীক ছিলো না। সত্য। জ্বলন্ত সত্য। আমার বুক থেকে আমার অপুকেও তো নিয়ে নিয়েছেন ভগবান, তা ব'লে কি সে ছিলো না?'

আবার একটু সময় চুপ। এই সময়ে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে এক ঝাঁক পাখি ডেকে উঠলো, প্রহরের পাখি। চমকে উঠে সীতা

বললো, সেদিনও সেই সময়ে ঠিক এমনি ক'রে বড়ো-বড়ো গাছ থেকে এক ঝাঁক পাখি ডেকে উঠেছিলো আর তৎক্ষণাৎ তার মধ্যে আমি ঈশ্বরের সংকেত শুনতে পেলাম। যেন ওরা আমার পরিজন, বান্ধব, আমাকে অভ্যর্থনা করছে, ডাকছে, বলছে এসো এসো, এই তো আমরা আছি। এতোগুলো প্রাণ। আমি দ্রুতপায়ে বড়ো-বড়ো গাছের ছায়ায় আড়াল করলাম নিজেকে। বাড়িটা পোড়ো হ'লেও তেমন ঝোপ-ঝাড় জঙ্গলে আকীর্ণ ছিলো না। বড়ো-বড়ো গাছের সমাবেশেই অন্ধকার। চাঁদের আলো প্রবিষ্ট হ'তে পারেনি সেখানে ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল থাকলেও যে আমি ভয়ে পিছপা হতাম তা নয়। মানুষের ভয় ছাড়া আমার আর কোনো ভয়ই কাজ করছিলো না। ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানো সাপ-খোপ পোকা-মাকড় বাঘ কিছুই কিছু-না মনে হচ্ছিলো। রাগ কোরো না, সবাই তো বিমানদা নয়, বিমানদার মতো মুষ্টিমেয় মানুষদের কথা আলাদা। বস্তুত একজন মেয়ের পক্ষে একজন কামার্ত পুরুষ যতো ভয়াবহ, তুমিই বলো এমন আর কোনো জীবজন্তু আছে তার সঙ্গে তুলনীয়?

এতোটা পথ এভাবে এসে আমি হাঁপাচ্ছিলাম। গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ডালপাতার আড়ালে নিজেকে সেঁটে রেখে চারিদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিলাম। জায়গাটা গভীর রাতের সোঁদা-সোঁদা গন্ধ নিয়ে পবিত্র বনভূমি। কিন্তু আমি ভাবছিলাম এরপর কী?

অনেক পরে, যখন মনে হ'লো আমি, গাছগুলো আর গাছের পাখিরা ছাড়া আর কেউ সেখানে নেই অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকালাম চারিদিকে। একটু দূরেই বিশাল বাড়িটি চাঁদের আলোয় স্নাত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে তার ভাঙাচোরা চেহারা নিয়ে। এতোবড়ো বাড়ির একটি কোণেও কি আমি এই রাত্রিটুকুর জন্য আশ্রয় পেতে পারি না?

গাছের আড়াল থেকে আস্তে আস্তে সরে এলাম এদিকে, খুব সাবধানে, খুব সতর্কভাবে পা ফেলতে ফেলতে একেবারে বাড়িটার গায়ে এসে দাঁড়ালাম। তাকিয়ে দেখি সামনেই দরজা। আস্তে ঠেলা দিলুম, অমনি খুলে গেলো। চওড়া কাঠের সিঁড়ি সোজা উঠে গেছে উপরে। আমি মোহের মতো সেই সিঁড়ি দিয়ে একতলা দোতলার অসংখ্য অগুণতি শূন্য ঘর ছাড়িয়ে একেবারে ছাদে উঠে এলাম। শেষ সিঁড়িটিতে পা দিয়েই আমার পা আটকে গেলো আমি স্তম্ভিত বিস্ময়ে একটি অলৌকিক দৃশ্য দেখে প্রায় হতচেতন হলাম।

একজন বড়ো-বড়ো চুলের বৃদ্ধলোক সেই বিস্তীর্ণ ছাদের চাঁদ-চোঁয়া আলোয় উন্মাদের মতো নাচছিলো এ-মাথা ও-মাথা জুড়ে। এই রুদ্র নৃত্যের কোনো তুলনা নেই।

'আমি ভয় পেলাম না, ফিরে গেলাম না, স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম। তখন আমার মনে কোনো অতীত রইলো না, ভবিষ্যৎ রইলো না, দুঃখবেদনা অভিমান অপমান আক্রোশ প্রতিশোধ প্রতিরোধ কোনো বৃত্তিই আর অবশিষ্ট রইলো না, শুধুমাত্র আনন্দ, এক ঐশ্বরিক আনন্দে বিভোর হলুম। আমার রোমাঞ্চিত অস্তিত্ব আমাকে জানিয়ে দিলো এরই নাম ব্রহ্মানন্দ।'

'কী আশ্চর্য!'

'কতো যে আশ্চর্য ঘটনা আমি কেমন ক'রে তোমাকে বোঝাবো। আমার বিস্ময়ের কোনো শেষ ছিলো না। কী অবিমিশ্র সুখ সবিতাদি সেই রাত্রিতে আমি স্বয়ং ভগবানের স্পর্শই বোধহয় অনুভব করেছিলাম। এখন আমি জানি তাঁর রাজত্বে কোনো অবিচার নেই, তাঁর পরিমিতির কোনো তুলনা নেই।

সেই নাচ দেখতে-দেখতে কতো সময় যে চ'লে গেলো আমি জানি না, আস্তে আস্তে ডুবে গেলো চাঁদ, গভীর রাত শেষ রাত হ'লো,

শেষ রাত্রিকে ভোরের সঙ্গমে বিলীন ক'রে সূর্যদেব তার অনুরাগের রং ছিটিয়ে দিলেন আকাশে। নাচতে-নাচতে লোকটি লম্বা হ'য়ে প'ড়ে গেলো মেঝেতে, বুঝতে পারলাম তাঁর চেতনা নেই। অর্থাৎ সমাধি।

মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছিলো আমি ছুটে গিয়ে তাঁর মাথা কোলে নিয়ে বসলাম, আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলাম, তাঁর শাদা পশমের মতো পাকা চুলে হাত বুলিয়ে দিলাম, ঝুঁকে প'ড়ে ডাকলাম 'বাবা।' ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে চোখ মেললেন তিনি তাকিয়ে বললেন, 'বেটি।'

তোমার মনে আছে সবিতাদি, আমাদের অল্পবয়সে একজন আশ্চর্য মানুষের কথা খবরের কাগজে বেরিয়েছিলো? ছবিটবি দিয়ে একেবারে পাতাজোড়া জীবনী। স্বামী সুব্রহ্মন্যম আয়েঙ্গার।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, জন্মাবধি নাচেন, গান করেন, পূর্বজন্মের কথা বলেন। লোকের ভালো মন্দ ব'লে দিতে পারেন—লোকেরা ওঁকে দেবতা ব'লে মানে—এও মনে আছে আমার বড়ো পিশেমশাই দর্শন করতে মাইসোরে চ'লে যান। এসে বলেন ঈশ্বরের বরপুত্র, অসামান্য মানুষ, মানুষও নন অতি মানুষ—।

'ইনিই তিনি।'

'ইনিই তিনি!'

'নাচ ওঁর প্রার্থনা ওঁর উপাসনা আরাধনা। বড়ো-বড়ো নাচিয়েরা সবাই ওঁর শিষ্য। শিক্ষা দেন দীক্ষাও দেন। চামুণ্ডা পাহাড়ে তাঁর কুটির আশ্রমও বলা যায়। বছরে একবার বেরোন। সময়টার জন্য ওৎ পেতে থাকে সবাই যে ধরতে পারে ধরে, যার উপর তুষ্ট হন কথা রাখেন তার। বিদেশিরাই ধরে বেশি, অনেক বিদেশি শিষ্য আছে আশ্রমে, শুধু তো নাচগান নয়, সন্ন্যাসীও তো। ভারতীয় সন্ন্যাসীদের প্রতি বিদেশির প্রেম অপরিসীম। এদেশে ওঁকে ওরা জ্যান্ত মহাদেব ব'লে বর্ণনা করে। বাংলার মাটিতে, কলকাতায় সেই

বছরই তাঁর প্রথম আগমন। এসেছিলেন দার্জিলিংয়ে, শিষ্যরাই নিয়ে এসেছিলো, ছিলেন জলপাহাড়ের মাথায়; ইমপ্রেসারিও প্রশান্ত সেন কাদের মুখে বার্তা পেয়ে ছুটে যান সেখানে পটিয়ে-পাটিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে একেবারে দলসহ ধ'রে নিয়ে আসেন।

কী ক'রে এই পোড়ো বাড়িতে এসে উঠলেন তারও একটা গল্প আছে। বংশানুক্রমে বাড়িটি যে মহিলার হস্তগত হয় তিনি ছিলেন বালবিধবা। ডিটেল্‌স্‌ জানি না, মোটকথা মহিলা চামুণ্ডা পাহাড়ে মাঝে মাঝেই যেতেন, গিয়ে থাকতেন কয়েক মাস ধ'রে। এই সন্ন্যাসীর আশ্রম গৃহটি তাঁরই রচনা। এই পাগলের প্রেমে পড়েছিলেন তিনি মৃত্যুকালে যথা সর্বস্বই এঁকে দিয়ে যান, মায় এই বাড়িটিও। ওঁর মুখেই শুনেছি মহিলাটির জন্যে তিনি শোকার্ত হয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পরে তিনি জেনেছিলেন মহিলার প্রতি তাঁর প্রেম ভগবৎ প্রেমের সত্যেই প্লাবিত ছিলো সেই প্রথম সেই শেষ।

বছরের পর বছর প'ড়ে থাকতে-থাকতে সংস্কারের অভাবে যত্নের অভাবে ঐ বিশাল বাড়ির এই দশা। কলকাতা শহরে পা দিয়েই এই ঠিকানায় চ'লে আসেন। প্রশান্ত সেন গুরুদেবকে এরকম একটি জঙ্গলাকীর্ণ পোড়ো বাড়িতে কিছুতেই উঠতে দিতে চাননি। কিন্তু তাঁকে কে রুখবে? ট্রেন থেকে নেমেই ঠিকানা দেখিয়ে বলেছেন আমাকে এখানে নিয়ে চলো। এসেই গোঁ ধরলেন অন্য কোথাও নয় এ বাড়িতেই থাকবেন।

কী মুশকিল ভেবে ছাখো। একটা ঘরও তো বাসোপযোগী নেই। আগে নিশ্চয়ই সাজানো গুছানো ছিলো। তালাটালা ভেঙে কে যে কবে সব কোথায় লোপাট ক'রে দিয়েছে কে জানে। কোনো একটি ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে গেলেন। হঠাৎ ব'লে উঠলেন, 'এই তো পেয়েছি, এটাই তাঁর ঘর। আমি এ ঘরেই থাকবো।'

কার ঘর, কী বৃত্তান্ত তখনো তো কেউ জানে না, কিন্তু ওঁর যা অভিরুচি তাতো মানতেই হবে! তক্ষুণি ঝপাঝপ ঝাড়ুদার এলো, যতোটা সম্ভব ধোয়া মোছা হ'লো, বাইরের হাঁটু পর্যন্ত জঙ্গল সাফ করতে লেগে গেলো লোকেরা, উনি রইলেন। একাই রইলেন। দলের লোকেরা অন্যত্র। সেটাও তাঁরই হুকুম।

আমি যে-রাত্রে ওখানে আশ্রয় পেয়েছিলুম, সেটা ওঁর দ্বিতীয় রাত্রি। সাতদিনের প্রোগাম নিয়ে এসেছিল এখানে।

পরে ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম বাড়িটি। কী সুন্দর বাড়ি। একতলা দোতলা মিলিয়ে চোদ্দখানা ঘর, কাজের লোকেদের আলাদা কোয়ার্টার, মালিক কুটিরও আলাদা, দারোয়ানের ঘর আলাদা, জমাদের ব্যারাক আলাদা। আর এই ছাদ। আমার মনে হয় মহিলার মনে আশা ছিলো কোনো একদিন তাঁর এই সন্ন্যাসী প্রেমিক আসবেন তাঁর বাড়িতে, এটাই হবে তাঁর নাচের আসল প্রাঙ্গণ, একেবারে আকাশের তলায় ঈশ্বরের দৃষ্টির নীচে। শ্বেতপাথরে বাঁধানো ধূ ধূ ছাদটি যেন এক আলাদা জগৎ, এ পাশে মাত্রই একখানা বড়ো ঘর আছে, সে ঘরের মেঝেও শ্বেতপাথরে বাঁধানো, কারুকার্যখচিত সিলিং, চারদিকে দেয়ালের চেয়ে দরজা জানালা বেশী। কে জানে, এ ঘরও হয়তো এই সন্ন্যাসীর কথা ভেবেই তৈরী।

ছাদটি যেন সত্যিই রঙ্গমঞ্চ। গুরুদেব বলেছিলেন, সারাজীবন সাধনা ক'রে যা আমি পাইনি, সমস্ত দিন-রাত অন্ধকার কক্ষে চক্ষু মুদ্রিত রেখে পদ্মাসনে বসে যা আমি পাইনি, ছাত্রশিষ্য নিয়ে দেশ বিদেশের সহস্র করতালির মধ্যে যা আমি পাইনি, সব আমি পেয়েছিলাম সেই রাত্রে সেই বিগলিত জ্যোৎস্না ধারার মধ্যে আকাশের তলায় ছাদের উপর নেচে। সেদিন সকাল থেকেই আমার মন বড়ো উন্মনা ছিলো, কেবলি মনে হচ্ছিলো যা আমি চাই তা তো

এ নয়। এই বিদ্যা আমাকে যিনি দিয়েছেন, যার দানে আমি সমৃদ্ধ তাঁকে তো আমি কোনোদিন একান্ত মনে এই বিদ্যা নিবেদন করিনি। এতোদিন শুধু লোকচক্ষে জাহির করেছি নিজেকে। তাঁর দেওয়া কৃতিত্ব ভাঙিয়ে তাঁকে ভুলে থেকেছি।

সন্ধ্যা থেকেই একা একা বসেছিলেন ছাদে। কারো সেখানে না ঢোকবার নোটিশ জারি করেছিলেন আগেই। দলের লোকেরা উঠেছিলো অন্য বাড়িতে, আসতো এখানে। সেটাও সেদিন নিষিদ্ধ ছিলো। শান্ত সমাহিত চিত্তে প্রার্থনায় বসে থাকতে থাকতে কখন যে উঠে কার উদ্দেশ্যে নাচতে শুরু করলেন কিছুই আর তাঁর মনে নেই।

তারপর সেই যে আমি বাবা ব'লে সম্বোধন করলুম, তিনি আমাকে 'বেটি, ব'লে জবাব দিলেন, বাকী জীবন সেই সম্পর্কই অটুট ছিলো আমাদের মধ্যে। পিতা আর কন্যা। দুঃখিনী মেয়েকে তিনি আপন হৃদয়ে গ্রহণ করলেন, আমিও তাঁকে আমার প্রত্যক্ষ ভগবান ভেবে সেবাদাসী হলুম।

শিশুদের যেমন তাদের মায়েরা অ আ ক খ শেখায়, আমার এই পিতাও আমাকে তেমনি ক'রে পা ফেলতে শিখিয়েছেন। তাল কর্ত্তন মুদ্রা মন্ত্রগুলি আস্তে-আস্তে উজাড় ক'রে দিয়ে গেছেন আমাকে। আট বছর ধ'রে এই গুরুর কাছে আমি একান্ত নিষ্ঠায় শিক্ষালাভ করেছি। তারপর একদিন দেহত্যাগ করলেন। সেই সময়ে আমরা উটকামণ্ডে ছিলাম। আমার পদ্মাসনা নাম তাঁরই দেওয়া, ভারতী খেতাবীটা পরে জুড়ে দিয়েছে লোকেরা। কখন যে জুড়েছে তা-ও জানি না।

॥ বারো ॥

সীতা থামলো। বললো, একেবারে সর্বতোভাবে বাইরে বেরিয়েছি গুরুদেবের দেহত্যাগের পরে। তার আগে সব সময়ে সঙ্গে থেকেছি, যখন যেখানে যান গিয়েছি কিন্তু নাচিনি। নাচলেও ক্বচিৎ কদাচ। শিক্ষা সম্পূর্ণ হবার আগেই কাজে নামা তিনি পছন্দ করতেন না।

তবু একসময় চারদিকে ছড়িয়ে গেল নাম, তিনি বললেন, আমি তোর মধ্যেই বেঁচে থাকবো। আমার ভগবান দত্ত দান আমার মৃত্যুর পরে তোর মধ্যেই সঞ্চারিত হবে।

'তাই হয়েছে সীতা, তাই হয়েছে—' আমার আবেগ কম্পিত কণ্ঠ থরথর করছিলো।

সীতা বললো, 'সব দিন না হোক, অনেক দিনই আমি সেটা অনুভব করি। চিন্তা করলে, বড়ো অদ্ভুত আমার জীবন।'

'এখানকার স্কুলটা কি তুই নিজেই স্থাপন করেছিস?'

'হ্যাঁ। এই শহরটা বাবার খুব পছন্দ ছিলো। কলোরাডোর পর্বতমালার মধ্যে উনি তাঁর পরমাত্মাকে দেখতে পেতেন। এক একটা চূড়ার মধ্যে একেক রূপে উপলব্ধি করতেন তাঁকে। আমিও কম প্রভাবিত হইনি তাতে।'

'উনি কি প্রায়ই আসতেন এদেশে?'

'ওঁর এদেশের শিষ্যরাই ওঁকে নিয়ে আসতো। শেষের দিকে নাচ গানের ব্যাপারটা আমার উপরই প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমিই শেখাতাম। উনি যোগ আর ধ্যান নিয়েই ব্যাপৃত থাকতেন।

নানা শহরেই আমারের যোগাশ্রম আছে, ওঁর অনেক শিষ্যও আছেন সেখানে যাঁরা উপযুক্ত শিক্ষক হিসেবে খুবই গণ্যমান্য।'

'তুই সেখানে যাস না?'

'কম। আমি এই নৃত্যবিদ্যারই আরাধনা করি। দেখতেই তো পাচ্ছ সন্নাসী পিতার কন্যা হ'য়েও সন্ন্যাসিনী নই, ওঁর বিভিন্ন কর্মধারার মধ্যে আমি এই ধারাতেই ভেসেছি। এর মধ্যেই আমি খুঁজে পেয়েছি আমাকে।'

'তা যে পেয়েছিস কোনো সন্দেহ নেই তাতে।'

'আমার অপুকেও আমি ফিরে পেয়েছি এই জীবনের মধ্যে।'

'আজ তোর নাচ দেখতে-দেখতে আমিও কোথায় কতোদূরে ভেসে যাচ্ছিলাম। আমিও যেন আমার বুকের মধ্যে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করছিলাম।'

'তুমি তো চিরকালই ধর্মপ্রাণ মানুষ।'

'তাই বুঝি?' আমি হাসলাম।

সীতা ওর খাট থেকে আমার খাটে এসে আমার পাশে বসলো, 'সবিতাদি—'

'বল।'

'মানুষের স্মৃতি কেন এতো দুর্বার?'

চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'রজতের কথা ভেবেই কি এ কথা বলছিস?'

চিন্তা ক'রে বললো, 'জানি না।'

আমি বললাম, 'রজতের সঙ্গে কি আর কখনো তোর দেখা হয়েছে?'

'না।'

'এতো নাম ডাক প্রতিপত্তি, ও কি কখনো নাচ দেখতে আসেনি?'

'আমি চামুণ্ডা পাহাড়ে আমার গুরুদেবের আশ্রমেই থাকি। গুরুদেবের মতো বিদেশী শিষ্যরা আমাকেও তাদের দেশেই টেনে নিয়ে আসে প্রতি বছর। ভারতবর্ষের মধ্যে দিল্লী বম্বে মাদ্রাজের নিমন্ত্রণেই আবদ্ধ রাখি নিজেকে, কলকাতা যাই না। যেতে চাই না।'

'কিন্তু গিয়েছিলি বোধহয় একবার? আমরা শুনলাম—'

'ঠিকই বলেছ। একবার গিয়েছিলাম। ঐ ইমপ্রেসারিও প্রশান্ত সেনই জোরজার ক'রে নিয়ে গেলেন। পোস্টারে-পোস্টারে ছেয়ে দিয়েছিলেন শহর।'

'তারপর?'

'ছবিটা নিশ্চয়ই চোখে পড়েছিলো?'

'কার?'

'আর কার? হারিয়ে যাওয়া অথবা পালিয়ে যাওয়া বৌকে দেখে নিশ্চয়ই কৌতূহল হ'য়েছিলো।'

'তারপর?'

'টিকিট কেটে সামনের আসনে গিয়ে বসেছিলো নাচ দেখতে।'

'তারপর?'

'শেষ হ'য়ে যাবার পরে শ্লিপ পাঠিয়েছিলো দেখা করতে চেয়ে। আমি দেখা করিনি।'

'কেন?'

সীতা উদাস দৃষ্টি মেলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললো, 'তখনো ওকে সম্পূর্ণভাবে ভুলতে পারিনি।'

'এখন পেরেছিস?'

'আমি একটি কেনেডিয়ান ছেলেকে ভালবাসি সবিতাদি।'

'ও।'

'ছেলেটি দার্শনিক, পণ্ডিত গুরুদেবেরই শিষ্য।'

'চামুণ্ডা আশ্রমেই থাকে বোধহয়?'

'থাকে না, যায়।' থেমে, 'সব ছুটিতেই যায়।'

'তোর জন্যই নিশ্চয় ?'

'হ্যাঁ।' থেমে, 'রাগ করছো ?'

'সে কী! রাগ করবো কেন ? খুশির কথাই তো।'

'সত্যি বলছো ?'

'সত্যিই বলছি। তুই কি বিয়ে করছিস তাকে ?'

'ভেবেছিলাম।'

'ছিলাম কেন ?'

'একটা ভারি মুশকিল হ'য়ে গেলো।'

'কী ?'

'বলবো ?'

'তোর ইচ্ছে।'

'তোমার কী ইচ্ছে ?'

'আমার ইচ্ছে তো শুনি।'

একটু ব্লাশ করলো সীতা, 'একদিন ছেলেটির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হ'য়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ওর বুকের মধ্যে আমি রজতের বুকের গন্ধ পেলাম—' চুপ করলো, উঠে আবার চ'লে গেলো নিজের খাটে, অস্ফুটে বললো, 'সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম আমার জীবনের প্রথম পুরুষটি এখনো আমাকে ছেড়ে যায়নি।'

'এটা তোর বাজে ধারণা।'

'হয়তো তাই। তবু সেই অপদার্থ লোকটার ভূত যদ্দিন না ঘাড় থেকে নামে তদ্দিন বোধহয় নিস্তার নেই।'

.'এটা তোর পিত্রালয়ের কুসংস্কার।'

'তা-ও হ'তে পারে। কিন্তু সেই মানসিকতাকে ঝেড়ে না-ফেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।'

'এবারেও আমিই তোর বিয়ে দেবো।'

'বৌ হবার যোগ্যতা বোধহয় আর আমার নেই, দেখি সেই বাচ্চাটা যদি দেয়, যদি এভাবে মা হ'তে পারি—'

'কী বলছিস তুই বোকার মতো—'

সীতা চাদরের তলায় ঢুকলো, গুটিসুটি হ'য়ে শুয়ে পড়তে-পড়তে বললো 'এসো এবার ঘুমুতে চেষ্টা করি। রাত তো শেষ হ'য়ে এলো।' পাশ ফিরলো সে।

খেয়াল হ'লো ঘরের মধ্যে এখন আর এক ফোঁটাও চাঁদের আলো নেই, তার বদলে ভোরের আলো ফুটি-ফুটি করছে। আমি তাকিয়ে রইলাম সীতার দিকে, জানি না সে সত্যি ঘুমোলো কিনা। আমার চোখে একবিন্দুও তন্দ্রার আভাস ছিলো না।

———